বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

শিশুদের লালন-পালন

[মাতা-পিতার দায়িত্ব ও সন্তানের করণীয়]

[বাংলা – bengali – البنغالية]

মূল: শাইখ মুহাম্মাদ ইবন জামীল যাইনূ রহ.

অনুবাদ: জাকের উল্লাহ আবুল খায়ের

সম্পাদনায়: মো: আবদুল কাদের

2011- 1432

﴿كيف نربي أولادنا وما هو واجب الآباء والأبناء؟﴾

« باللغة البنغالية »

محمد بن جميل زينو

ترجمة: ذاكر الله أبو الخير

مراجعة: محمد عبد القادر

2011 - 1432

IslamHouse.com

অনুবাদকের কথা

শিশুই হল, দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। শিশুদের বাল্য কালের শিক্ষা-দীক্ষা যদি ভালো হয়, তবে তাদের আগামী দিন ও ভবিষ্যৎ ভালো হবে। তাতে দেশ, জাতি ও সমাজ তাদের দ্বারা হবে লাভবান ও উপকৃত। এ জন্য শিশুদের শিক্ষা, তালীম, তরবিয়ত ও তাদের চরিত্রবান করে ঘড়ে তোলার প্রতি গুরুত্ব দেয়া, অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে কোন কিছু লিখে জাতির সামনে তুলে ধরার চিন্তা ও স্বপ্ন অনেক দিন থেকেই লালন করছি। কিন্তু যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা ও সময়ের অভাবে তা আর বাস্তবে রূপ দিতে পারি নি। তবে সম্প্রতি আমার প্রাণ-প্রিয় সাইট ইসলাম হাউসে **শাইখ মুহাম্মাদ ইবন জামীল যাইনূ রহ.** এর একটি রিসালা এ বিষয়ে পেয়ে আমি আমার চিন্তা ও লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুযোগটি গ্রহণ করি। চিন্তা করলাম এ লিখকের বইটি যদি অনুবাদ করে বাংলা-ভাষাভাষীদের জন্য তুলে ধরা হয়, তাতে তারা উপকৃত হবে এবং আমি নিজে কিছু লেখার চেয়েও এ রিসালাটি অনুবাদ করা অধিক ফলপ্রসূ হবে।

লেখক এ বইটিতে কুরআন ও হাদিসের আলোকে শিশুদের উপদেশ দেয়া, মাতা-পিতার সাথে সৎ ব্যবহার করা, তাদের খেদমত করা ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। শিশুরা কীভাবে ওজু, গোসল, তায়াম্মুম ও সালাত আদায় করবে, তাও তিনি এ রিসালাটিতে আলোচনা করেছেন। এ ছাড়াও শিশুরা যখন বড় হতে থাকবে, তখন মাতা-পিতার করণীয় কি এবং মাতা-পিতার প্রতি তাদের দায়িত্ব কি হওয়া উচিত; তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তিনি তুলে ধরেছেন। আশা করি পাঠকগণ রিসালাটি পাঠ করে উপকৃত হবেন। যদি একজন পাঠকও এ রিসালাটি পড়ে উপকৃত হন, তাহলে আমি ধরে নিব আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আমার নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে। যেকোনো কাজ করতে গেলেই ভুল-ভ্রান্তি হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং আমিও স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে নই। যদি কোন সু-হৃদয়বান পাঠকের চোখে কোন ভুল ধরা পড়ে, তা সংশোধন করে দিলে কৃতজ্ঞ হব। আমি আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে আমার অসুস্থ পিতা আল-হাজ্ব আবুল খায়ের সাহেবের জন্য উৎসর্গ করছি; যার অকৃত্রিম ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা ও সঠিক পথে লালন-পালন করার আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমি ধন্য। পাঠকদের নিকট বিনীত প্রার্থনা হল, আপনারা আমার অসুস্থ আব্বার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ তাকে শিফা দান করুন। আমীন!

অবশেষে আপনাদের নিকট আমার আখেরি ফরিয়াদ হল, এ রিসালাটি আমি ইলেকট্রিক মিডিয়াতেই দিচ্ছি; তাতে শুধু ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাঠ করা যাবে। সাথে সাথে যদি প্রিন্ট করে বিতরণ করা যেত, তবে অসংখ্য বাংলা-ভাষী, যারা এখনো পর্যন্ত ইন্টারনেট ব্যবহারে

অভ্যস্ত নয়, তারাও উপকৃত হত। যদি কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি ও আহলে-খাইর এ অবশিষ্ট কাজটি সম্পাদন করেন, তাহলে তিনি অধিক কল্যাণ ও সাওয়াবের অধিকারী হবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে জাযায়ে খাইর দিন। আমীন!

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد؛؛

শিশুদের লালন-পালন বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ের উপর জানা বা জ্ঞান থাকার সাথে মাতা-পিতা ও সন্তান উভয়ের কল্যাণ জড়িত। শুধু তাই নয়, একটি সমাজের উন্নতি ও জাতির ভবিষ্যৎ শিশুদের শিক্ষা ও লালন পালনের উপর নির্ভর করে। শিশুরাই হল, জাতির কর্ণধার ও ভবিষ্যৎ। আজকের শিশুই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। এ কারণেই ইসলাম ও মনীষীগণ বিশেষ করে সমস্ত-মনীষীদের-সরদার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যাকে মহান আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতা ও সন্তান উভয়ের জন্য শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক হিসেবে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন, তিনি শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সঠিকভাবে লালন-পালন করার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন, যাতে তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

এ কারণেই আমরা কুরআনে করীমে দেখতে পাই যে, মহান আল্লাহ তা'আলা শিক্ষণীয় ও উপদেশমূলক অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যাতে সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, লোকমান হাকিমের ঘটনা; এ ঘটনাতে তিনি তার ছেলেকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দেন, যা কুরআন সবিস্তারে আলোচনা করেছে। অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাল্যকাল থেকেই তার চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের অন্তরে তাওহীদের বীজ বপন করে জাতিকে জানিয়ে দেন যে, বাল্যকাল থেকেই একজন সন্তানকে তাওহীদের শিক্ষা দিতে হবে। আমাদের এ বইয়ে একজন পাঠক অবশ্যই জানতে পারবে, সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার কর্তব্য কি আবার মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়-দায়িত্ব কি? মহান আল্লাহর নিকট আকুল আবেদন, তিনি যেন এ বইটি দ্বারা পাঠকদের উপকৃত করেন এবং বইটিকে যেন একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কারণ বানিয়ে দেন।

মুহাম্মাদ ইবন জামীল যাইনূ

সন্তানের প্রতি লোকমান হাকীমের উপদেশাবলি

প্রথমে লোকমান আ. তার ছেলেকে যেভাবে উপদেশ দিয়েছেন, তা আলোচনা করা হল। কারণ, লোকমান আ. তার ছেলেকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা এতই সুন্দর ও গ্রহণ যোগ্য যে, মহান আল্লাহ তা'আলা তা কুরআনে করীমে উল্লেখ করে কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত উম্মতের জন্য তিলাওয়াতে উপযোগী করে দিয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্তের জন্য তা আদর্শ করে রেখেছেন।

লোকমান আ. তার ছেলেকে যে উপদেশ দেন তা নিম্নরূপ:

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ ﴾

অর্থ, "আর স্মরণ কর, যখন লোকমান তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল...।"

এ উপদেশগুলো ছিল অত্যন্ত উপকারী, যে কারণে মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআনে করীমে লোকমান হাকিমের পক্ষ থেকে উল্লেখ করেন।

প্রথম উপদেশ: তিনি তার ছেলেকে বলেন,

﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

অর্থ, "হে প্রিয় বৎস আল্লাহর সাথে শিরক করো না, নিশ্চয় শিরক হল বড় যুলুম।"

এখানে লক্ষণীয় যে, প্রথমে তিনি তার ছেলেকে শিরক হতে বিরত থাকতে নির্দেশ দেন। একজন সন্তান তাকে অবশ্যই জীবনের শুরু থেকেই আল্লাহর তাওহীদে বিশ্বাসী হতে হবে। কারণ, তাওহীদই হল, যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতার একমাত্র মাপকাঠি। তাই তিনি তার ছেলেকে প্রথমেই বলেন, আল্লাহর সাথে ইবাদতে কাউকে শরিক করা হতে বেচে থাক। যেমন, মৃত ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করা অথবা অনুপস্থিত ও অক্ষম লোকের নিকট সাহায্য চাওয়া বা প্রার্থনা করা ইত্যাদি। এছাড়াও এ ধরনের আরও অনেক কাজ আছে, যেগুলো শিরকের অন্তর্ভুক্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "দোআ হল ইবাদত" الدعاء هو العبادة সুতরাং আল্লাহর মাখলুকের নিকট দোআ করার অর্থ হল, মাখলুকের ইবাদত করা, যা শিরক।

মহান আল্লাহ তা'আলা যখন তার বাণী, ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا۟ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ﴾ অর্থাৎ "তারা তাদের ঈমানের সাথে যুলুমকে একত্র করে নি।" এ আয়াত নাযিল করেন, তখন বিষয়টি

মুসলিমদের জন্য কষ্টকর হল, এবং তারা বলাবলি করল যে, আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে তার উপর অবিচার করে না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আলোচনা শোনে বললেন,

{ ليس ذلك ، إنما هو الشرك ، ألم تسمعوا قول لقمان لابنه :يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ .

অর্থাৎ, ‘‘তোমরা যে রকম চিন্তা করছ, তা নয়, এখানে আয়াতে যুলুম দ্বারা উদ্দেশ্য হল, শিরক। তোমরা কি লোকমান আ. তার ছেলেকে যে উপদেশ দিয়েছে, তা শোন নি? তিনি তার ছেলেকে বলেছিলেন,

{يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ .

অর্থ, হে প্রিয় বৎস আল্লাহর সাথে শিরক করো না, নিশ্চয় শিরক হল বড় যুলুম।’’

দ্বিতীয় উপদেশ: মহান আল্লাহ তা‘আলা মানবজাতিকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তার বর্ণনা দিয়ে বলেন,

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ .

অর্থ, ‘‘আর আমি মানুষকে তার মাতাপিতার ব্যাপারে [সদাচরণের] নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে, তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে; সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন-তো আমার কাছেই।’’ [সূরা লোকমান: ১৪]

তিনি তার ছেলেকে কেবলই আল্লাহর ইবাদত করা ও তার সাথে ইবাদতে কাউকে শরীক করতে নিষেধ করার সাথে সাথে মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করার উপদেশ দেন। কারণ, মাতা-পিতার অধিকার সন্তানের উপর অনেক বেশি। মা তাকে গর্ভধারণ, দুধ-পান ও ছোট বেলা লালন-পালন করতে গিয়ে অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা ও কষ্ট সইতে হয়েছে। তারপর তার পিতাও লালন-পালনের খরচাদি, পড়া-লেখা ও ইত্যাদির দায়িত্ব নিয়ে তাকে বড় করছে এবং মানুষ হিসেবে ঘড়ে তুলছে। তাই তারা উভয় সন্তানের পক্ষ হতে অভিসম্পাত ও খেদমত পাওয়ার অধিকার রাখে।

তৃতীয় উপদেশ: মহান আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে করীমে মাতা-পিতা যখন তোমাকে শিরক বা কুফরের নির্দেশ দেয়, তখন তোমার করণীয় কি হবে তার বর্ণনা দিয়ে বলেন,

﴿وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

অর্থ, “আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না। এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে করবে সদ্ভাবে। আর আমার অনুসরণ কর তার পথ, যে আমার অভিমুখী হয়। তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, যা তোমরা করতে।” [সূরা লোকমান: ১৫]

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. আয়াতের তাফসীরে বলেন, ‘যদি তারা উভয়ে তোমাকে পরি-পূর্ণরূপে তাদের দ্বীনের আনুগত্য করতে বাধ্য করে, তাহলে তুমি তাদের কথা শুনবে না এবং তাদের নির্দেশ মানবে না। তবে তারা যদি দ্বীন কবুল না করে, তারপরও তুমি তাদের সাথে কোন প্রকার অশালীন আচরণ করবে না। তাদের দ্বীন কবুল না করা তাদের সাথে দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করাতে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। তুমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহারই করবে। আর মুমিনদের পথের অনুসারী হবে, তাতে কোন অসুবিধা নাই।’

এ কথার সমর্থনে আমি বলব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণীও বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট ও শক্তিশালী করেন, তিনি বলেন,

« لا طاعة لأحد في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف »

“আল্লাহর নাফরমানিতে কোন মাখলুকের আনুগত্য চলবে না। আনুগত্য-তো হবে একমাত্র ভালো কাজে।”

চতুর্থ উপদেশ: লোকমান হাকিম তার ছেলেকে কোন প্রকার অন্যায় অপরাধ করতে নিষেধ করেন। তিনি এ বিষয়ে তার ছেলেকে যে উপদেশ দেন, মহান আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে তার বর্ণনা দেন। মহান আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ .

অর্থ, “হে আমার প্রিয় বৎস! নিশ্চয় তা [পাপ-পুণ্য] যদি সরিষা দানার পরিমাণও হয়, অত:পর তা থাকে পাথরের মধ্যে কিংবা আসমান সমূহে বা জমিনের মধ্যে, আল্লাহ তাও নিয়ে আসবেন; নিশ্চয় আল্লাহ সুক্ষ্মদর্শী সর্বজ্ঞ।” [সূরা লোকমান: ১৬]

আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন, অন্যায় বা অপরাধ যতই ছোট হোক না কেন, এমনকি যদি তা শস্য-দানার সমপরিমাণও হয়, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তা‘আলা তা উপস্থিত করবে এবং মীযানে ওজন দেয়া হবে। যদি তা ভালো হয়, তাহলে

তাকে ভালো প্রতিদান দেয়া হবে। আর যদি খারাপ কাজ হয়, তাহলে তাকে খারাপ প্রতিদান দেয়া হবে।

পঞ্চম উপদেশ: লোকমান হাকিম তার ছেলেকে সালাত কায়েমের উপদেশ দেন। মহান আল্লাহ তা'আলা তার বর্ণনা দিয়ে বলেন, ﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ অর্থাৎ, "হে আমার প্রিয় বৎস সালাত কায়েম কর", তুমি সালাতকে তার ওয়াজিবসমূহ ও রোকনসমূহ সহ আদায় কর।

ষষ্ঠ উপদেশ:

﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

অর্থাৎ "তুমি ভালো কাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ হতে মানুষকে নিষেধ কর।" বিনম্র ভাষায় তাদের দাওয়াত দাও, যাদের তুমি দাওয়াত দেবে তাদের সাথে কোন প্রকার কঠোরতা করো না।

সপ্তম উপদেশ: আল্লাহ বলেন, ﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ﴾ "যে তোমাকে কষ্ট দেয় তার উপর তুমি ধৈর্য ধারণ কর।" আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, যারা ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং খারাপ ও মন্দ কাজ হতে মানুষকে নিষেধ করবে তাকে অবশ্যই কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে এবং অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে। যখন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে তখন তোমার করণীয় হল, ধৈর্যধারণ করা ও ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। রাসূল সা. বলেন,

«المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ، أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم».

"যে ঈমানদার মানুষের সাথে উঠা-বসা ও লেনদেন করে এবং তারা যে সব কষ্ট দেয়. তার উপর ধৈর্য ধারণ করে, সে— যে মুমিন মানুষের সাথে উঠা-বসা বা লেনদেন করে না এবং কোন কষ্ট বা পরীক্ষার সম্মুখীন হয় না—তার থেকে উত্তম।"

﴿إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾

অর্থ, "নিশ্চয় এগুলো অন্যতম সংকল্পের কাজ।" অর্থাৎ, মানুষ তোমাকে যে কষ্ট দেয়, তার উপর ধৈর্য ধারণ করা অন্যতম দৃঢ় প্রত্যয়ের কাজ।

অষ্টম উপদেশ:

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾

অর্থ, "আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।"

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন, 'যখন তুমি কথা বল অথবা তোমার সাথে মানুষ কথা বলে, তখন তুমি মানুষকে ঘৃণা করে অথবা তাদের উপর অহংকার করে, তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে না। তাদের সাথে হাস্যোজ্জ্বল হয়ে কথা বলবে। তাদের জন্য উদার হবে এবং তাদের প্রতি বিনয়ী হবে।'
কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

تبسمك في وجه أخيك لك صدقة .

"তোমার অপর ভাইয়ের সম্মুখে তুমি মুচকি হাসি দিলে, তাও সদকা হিসেবে পরিগণিত হবে।"

নবম উপদেশ: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً﴾

"অহংকার ও হঠকারিতা প্রদর্শন করে জমিনে হাটা চলা করবে না।" কারণ, এ ধরনের কাজের কারণে আল্লাহ তোমাকে অপছন্দ করবে। এ কারণেই মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"
অর্থাৎ যারা নিজেকে বড় মনে করে এবং অন্যদের উপর বড়াই করে, মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের পছন্দ করে না।

দশম উপদেশ: নমনীয় হয়ে হাটা চলা করা। মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআনে করীমে বলেন: ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ "আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর।" তুমি তোমার চলাচলে স্বাভাবিক চলাচল কর। খুব দ্রুত হাঁটবে না আবার একেবারে মন্থর গতিতেও না। মধ্যম পন্থায় চলাচল করবে। তোমার চলাচলে যেন কোন প্রকার সীমালঙ্ঘন না হয়।

একাদশ উপদেশ: নরম সূরে কথা বলা। লোকমান হাকীম তার ছেলেকে নরম সূরে কথা বলতে আদেশ দেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ﴾ "তোমার আওয়াজ নিচু কর।" আর কথায় কোন তুমি কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করবে না। বিনা প্রয়োজনে তুমি তোমার আওয়াজকে উঁচু করো না। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾

"নিশ্চয় সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল, গাধার আওয়াজ।"

আল্লামা মুজাহিদ বলেন, 'সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল, গাধার আওয়াজ। অর্থাৎ, মানুষ যখন বিকট আওয়াজে কথা বলে, তখন তার আওয়াজ গাধার আওয়াজের সাদৃশ্য হয়। আর এ ধরনের বিকট আওয়াজ মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট একেবারেই অপছন্দনীয়। বিকট আওয়াজকে গাধার আওয়াজের সাথে তুলনা করা প্রমাণ করে যে, বিকট শব্দে আওয়াজ করে কথা বলা হারাম। কারণ, মহান আল্লাহ তা'আলা এর জন্য একটি খারাপ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। যেমনিভাবে—

ক. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«ليس لنا مثل السوء ، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه»

"আমাদের জন্য কোন খারাপ ও নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হতে পারে না। কোন কিছু দান করে ফিরিয়ে নেয়া কুকুরের মত, যে কুকুর বমি করে তা আবার মুখে নিয়ে খায়।"

খ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«إذا سمعتم أصوات الديكة ، فسلوا الله من فضله ، فإنها رأت ملكاً ، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان ، فإنها رأت شيطاناً» .

"মোরগের আওয়াজ শোনে তোমরা আল্লাহর নিকট অনুগ্রহ কামনা কর, কারণ, সে নিশ্চয় কোন ফেরেশতা দেখেছে। আর গাধার আওয়াজ শোনে তোমরা শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। কারণ, সে অবশ্যই একজন শয়তান দেখেছে।"

দেখুন: তাফসীর ইবন কাসীর, খ. ৩ পৃ. ৪৪৬

আয়াতের দিক-নির্দেশনা:-

১. আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয়, যে সব কাজ করলে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত হয়, পিতা তার ছেলেকে সে বিষয়ে উপদেশ দিবে।

২. উপদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে তাওহীদের উপর অটল ও অবিচল থাকতে এবং শিরক থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেবে। কারণ, শিরক হল, এমন এক যুলুম বা অন্যায়, যা মানুষের যাবতীয় সমস্ত আমলকে বরবাদ করে দেয়।

৩. প্রত্যেক ঈমানদারের উপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব হল, মাতা-পিতার কৃতজ্ঞতা বা শুকরিয়া আদায় করা। তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা, কোন প্রকার খারব ব্যবহার না করা এবং তাদের উভয়ের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা।

৪. আল্লাহর নাফরমানি হয় না, এমন কোন নির্দেশ যদি মাতা-পিতা দিয়ে থাকে, তখন সন্তানের উপর তাদের নির্দেশের আনুগত্য করা ওয়াজিব। আর যদি আল্লাহর নাফরমানি হয়, তবে তা পালন করা ওয়াজিব নয়। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: «لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف» অর্থ: “আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে কোন মাখলুকের আনুগত্য চলে না; আনুগত্য-তো হবে ভালো কাজে”।

৫. প্রত্যেক ঈমানদারের উপর কর্তব্য হল, আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী মুমিন-মুসলিমদের পথের অনুকরণ করা, আর অমুসলিম ও বিদআতিদের পথ পরিহার করা।

৬. প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করতে হবে। আর মনে রাখবে কোন নেক-কাজ তা যতই ছোট হোক না কেন, তাকে তুচ্ছ মনে করা যাবে না এবং কোন খারাপ-কাজ তা যতই ছোট হোক না কেন, তাকে ছোট মনে করা যাবে না এবং তা পরিহার করতে কোন প্রকার অবহেলা করা চলবে না।

৭. সালাতের যাবতীয় আরকান ও ওয়াজিবগুলি সহ সালাত কায়েম করা প্রত্যেক মুমিনের উপর ওয়াজিব; সালাতে কোন প্রকার অবহেলা না করে, সালাতের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া এবং খুশুর সাথে সালাত আদায় করা ওয়াজিব।

৮. জেনেশুনে, সামর্থানুযায়ী সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করতে হবে। না জেনে এ কাজ করলে অনেক সময় হিতে-বিপরীত হয়। আর মনে রাখতে হবে, এ দায়িত্ব পালনে যথা সম্ভব নমনীয়তা প্রদর্শন করবে; কঠোরতা পরিহার করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان»

অর্থ: "তোমাদের কেউ যদি কোন অন্যায় কাজ সংঘটিত হতে দেখে, তখন সে তাকে তার হাত দ্বারা প্রতিহত করবে। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তবে তার মুখ দ্বারা। আর তাও যদি সম্ভব না হয়, তাহলে সে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবে। আর এ হল, ঈমানের সর্বনিম্নস্তর।"

৯. মনে রাখতে হবে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে বারণকারীকে অবশ্যই-অবশ্যই ধৈর্যশীল হতে হবে। ধৈর্যের কোন বিকল্প নাই। ধৈর্য ধারণ করা হল, একটি মহৎ কাজ। আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন।

১০. হাটা চলায় গর্ব ও অহংকার পরিহার করা। কারণ, অহংকার করা সম্পূর্ণ হারাম। যারা অহংকার ও বড়াই করে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না।

১১. হাটার সময় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে হাটতে হবে। খুব দ্রুত হাঁটবে না এবং একেবারে ধীর গতিতেও হাঁটবে না।

১২. প্রয়োজনের চেয়ে অধিক উচ্চ আওয়াজে কথা বলা হতে বিরত থাকবে। কারণ, অধিক উচ্চ আওয়াজ বা চিৎকার করা হল গাধার স্বভাব। আর দুনিয়াতে গাধার আওয়াজ হল, সর্ব নিকৃষ্ট আওয়াজ।

শিশুদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে ছিলাম, তখন তিনি আমাকে ডেকে বললেন, **"হে বৎস! আমি কি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দেব?"** এ বলে রাসূল আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে কিছু উপদেশ দেন। নিম্নে তা তুলে ধরা হল:

প্রথম উপদেশ:

احفظ الله يحفظك। "তুমি আল্লাহর হেফাজত কর আল্লাহ তোমার হেফাজত করবে" : অর্থাৎ, তুমি আল্লাহর নির্দেশ মেনে চল এবং যে সব কাজ হতে আল্লাহ তোমাকে নিষেধ করেছে, সে সব কাজ হতে বিরত থাক। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তা বিধান করবে।

দ্বিতীয় উপদেশ:

احفظ الله تجده تجاهك (أمامك) "তুমি আল্লাহকে হেফাজত কর, তখন তুমি তাঁকে তোমার সম্মুখেই পাবে।" অর্থাৎ, তুমি আল্লাহ তা'আলার বিধানের সংরক্ষণ ও আল্লাহর হক রক্ষা কর; তবে তুমি আল্লাহকে এমন পাবে যে, তিনি তোমাকে ভাল কাজের তাওফিক দেবে এবং তোমাকে তোমার যাবতীয় কর্মে সাহায্য করবে।

তৃতীয় উপদেশ:

إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله "যখন তুমি কোন কিছু চাইবে, আল্লাহর নিকট চাইবে। যখন কোনো সাহায্য চাইবে, আল্লাহ্‌র কাছেই চাইবে।" অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতের কোন বিষয়ে সাহায্যের প্রয়োজন হলে, তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাও। বিশেষ করে, যে কাজ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সমাধান করতে পারে না, তা আল্লাহর নিকটই চাইবে; কোন মাখলুকের নিকট চাইবে না। যেমন, সুস্থতা, রিযক, হায়াত, মওত ইত্যাদি। এগুলি এমন কাজ, যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সমাধান করতে পারে না।

চতুর্থ উপদেশ:

وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك

"একটি কথা মনে রাখবে, যদি সমস্ত উম্মত একত্র হয়ে তোমার কোন উপকার করতে চায়, আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য যতটুকু উপকার লিপিবদ্ধ করেছে, তার বাইরে বিন্দু পরিমাণ উপকারও তোমার কেউ করতে পারবে না, যদি আল্লাহ তোমার উপকার না চায়।

আর সমস্ত উম্মত একত্র হয়ে যদি তোমার কোন ক্ষতি করতে চায়, আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য যতটুকু ক্ষতি লিপিবদ্ধ করেছে, তার বাইরে বিন্দু পরিমাণ ক্ষতিও তোমার কেউ করতে পারবে না, যদি আল্লাহ তোমার ক্ষতি না চায়।" অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য ভালো ও মন্দের যে, ভাগ্য নির্ধারণ করেছে, তার বাইরে কোন কিছুই বাস্তবায়িত হবে না। এ বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক।

পঞ্চম উপদেশ:

رفعت الأقلام وجفت الصحف "কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে ও কাগজ শুকিয়ে গেছে।" তাই আল্লাহর উপর তাওয়াককুল করতে হবে। তাওয়াককুল করার অর্থ হল, উপকরণ অবলম্বন করে তাওয়াককুল/ভরসা করা। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উষ্ট্রীর মালিককে বলেন, তুমি আগে উষ্ট্রীকে বেঁধে রাখ এবং আল্লাহর উপর তাওয়াককুল কর।

ষষ্ঠ উপদেশ:

تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة "সচ্ছল অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর, বিপদে তোমাকে আল্লাহ স্মরণ করবে।" অর্থাৎ, সচ্ছল অবস্থায় তুমি আল্লাহর হক ও মানুষের হক্ক আদায় কর, বিপদে আল্লাহ তোমাকে মুক্তি দেবে।

সপ্তম উপদেশ:

وأعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك

"মনে রেখো— যা তুমি পেলে না, তা তোমার পাবার ছিল না; আর যা তুমি পেলে তা তুমি না পেয়ে থাকতে না।" অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে কোন কিছু দান না করলে, তা কখনোই তুমি লাভ করতে পারবে না। আর যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কোন কিছু দান করে, তা বাধা দেয়ার কেউ নাই।

অষ্টম উপদেশ:

واعلم أن النصر مع الصبر "আর জেনে রাখ, বিজয় ধৈর্যের সাথে।" অর্থাৎ, শত্রু ও নফসের বিপক্ষে সাহায্য বা বিজয় লাভ ধৈর্য ধারণের উপর নির্ভর করে। সুতরাং, আমাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

নবম উপদেশ:

وأن الفرج مع الكرب "বিপদের সাথেই মুক্তি আসে।" মুমিন বান্দা যেসব বিপদের সম্মুখীন হয়, তারপরই মুক্তি আসে।

দশম উপদেশ:

وأن مع العسر يسرا "কষ্টের সাথেই সুখ।" এক মুসলিম যে কষ্টের মুখোমুখি হয়, তা কখনোই স্থায়ী হয় না। কারণ, তারপর অবশ্যই আরাম বা সুখ আসে এবং আসবেই।

হাদিসের নির্যাস:

1. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের ভালোবাসতেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কে নিজের পিছনে বসান এবং আদর করে তিনি তাকে হে বৎস বলে আহ্বান করেন, যাতে সে সতর্ক হয় এবং রাসুলের কথার প্রতি মনোযোগী হয়।
2. শিশুদের তিনি আল্লাহর আনুগত্য করা ও তার নাফরমানি হতে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিতেন, যাতে দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের কল্যাণ নিশ্চিত হয়।
3. যখন কোন বান্দা সচ্ছলতা, সুস্থতা ও ধনী অবস্থায় আল্লাহ ও তার বান্দাদের অধিকার আদায় করে, আল্লাহ তা'আলা বিপদে তাকে মুক্তি দেবে এবং সাহায্য করবে।
4. আল্লাহর নিকট কোন কিছু চাওয়া ও সাহায্য প্রার্থনার তালীম দেয়ার মাধ্যমে শিশুদের অন্তরে ঈমানের বীজ বপন করে দেয়া, মাতা-পিতা ও অভিভাবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ছোট বেলা থেকেই শিশুদের অন্তরে ঈমানের বীজ বপন করে দিতে হবে, যাতে বড় হলে তার পথভ্রষ্ট না হয়।
5. ঈমানের রোকনসমূহ হতে একটি রোকন হল, ভাল ও মন্দের তকদীরের উপর বিশ্বাস করা। বিষয়টি শিশুদের অন্তরে গেঁথে দিতে হবে।
6. শিশুদের ইতিবাচক মনোভাবের উপর গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা আশা, আকাঙ্ক্ষা ও সাহসিকতার সাথে তাদের জীবনের ভবিষ্যৎ রচনা করে এবং তাদের জাতির জন্য কর্ণধার ও ত্রাণকর্তা হিসেবে আর্বিভাব হতে পারে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وأعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا» .

"আর জেনে রাখ: ধৈর্যের সাথেই বিজয়, বিপদের সাথেই মুক্তি, কষ্টের সাথেই সুখ।"

ইসলামের রোকনসমূহ

জীবনের শুরুতেই শিশুদের ঈমান ও ইসলামের রোকনসমূহ তালীম দিতে হবে, যাতে তারা বড় হয়ে, তা হতে দূরে সরে না যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি:

এক. “এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন হক ইলাহ নাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।” অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নাই আর আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে মুহাম্মদ এর আনুগত্য করা ওয়াজিব।[1]

দুই. “সালাত কায়েম করা” : সালাতের আরকান ও ওয়াজিবসমূহ সহ খুশুর সাথে সালাত আদায় করা।

তিন. “যাকাত প্রদান করা” : যদি কোন মুসলিম তার মৌলিক প্রয়োজনের বাইরে ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ বা তার সমপরিমাণ অর্থের মালিক হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে যখন তার এ সম্পদের উপর এক বছর অতিবাহিত হয়; তখন তাকে শতকরা ২.৫ টাকা যাকাত দিতে হবে। এ-ছাড়াও আরও অনেক সম্পদ আছে যেগুলোর উপর যাকাত ওয়াজিব হয়। সে সব সম্পদের যাকাত শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত হারে প্রদান করতে হয়।

চার. “বায়তুল্লাহর হজ করা” : হজ তার উপর ফরয হবে, যে হজ করার সামর্থ্য রাখে।

পাঁচ. “রমযানের রোজা রাখা:” রোজা বলতে আমরা বুঝি, নিয়ত সহকারে ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খানা-পিনা ও রোজার পরিপন্থী সবধরনের কাজ হতে বিরত থাকা।

---

[1] ক. ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই’ সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ হলো: আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত না করা, অন্য কাউকে না ডাকা; তাঁকে তার কেবল শরী‘আতের মাধ্যমেই ইবাদত করা; আর শুধুমাত্র কুরআন ও সুন্নাহ হতে নির্গত শরী‘আত অনুযায়ীই বিচার-ফয়সালা করা।

খ. ‘মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল’ সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ হলো: যে আদেশ তিনি দিয়েছেন তা আনুগত্য করা; যে সংবাদ তিনি এনেছেন তা বিশ্বাস করা; আর যা থেকে তিনি বিরত থাকতে বলেছেন ও সাবধান করেছেন, তা থেকে দূরে থাকা। কেননা, তার আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য।

ঈমানের রোকনসমূহ

১. “আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা”: আল্লাহর অস্তিত্ব এবং ইবাদতে ও সিফাতসমূহে তাঁর একত্ব সম্পর্কে প্রগাঢ় বিশ্বাস করা।

২. “আল্লাহর ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা” : ফেরেশতা হল, আল্লাহরই মাখলুক; যারা আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করে এবং তিনি যা করতে বলেন, তাই করে; তার কোন প্রকার এদিক সেদিক করে না এবং করার ক্ষমতা রাখে না।

৩. “আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা” : আল্লাহর নাযিল-কৃত আসমানি কিতাব তাওরাত, জবুর, ইঞ্জিল ও সর্বোত্তম কিতাব কুরআনের প্রতি ঈমান আনা।

৪. “আল্লাহর রাসূলদের প্রতি ঈমান আনা” : সর্ব প্রথম রাসূল হলেন নূহ আ. আর সর্বশেষ রাসূল হল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

৫. “আখিরাতের প্রতি ঈমান আনা” : এর অর্থ হল, হিসাব দিবসের প্রতি বিশ্বাস করা। মানুষের যাবতীয় কর্মের উপর অবশ্যই হিসাব নেয়া হবে এবং তার কর্মের বিনিময়ে তাকে প্রতিদান দেয়া হবে, যদি তার কর্ম ভালো হয়, তবে ভালো প্রতিদান আর যদি খারাপ হয়, তবে খারাপ প্রতিদান।

৬. “তাকদীরের ভালো ও মন্দের প্রতি ঈমান রাখা” : ভালো ও মন্দের তকদীরের উপর রাজি-খুশি থাকা। কারণ, এটা আল্লাহরই নির্ধারণ। (তবে শুধু এর উপর নির্ভর না করে থেকে বৈধ উপায়- উপকরণ গ্রহণ করতে হবে।)

[মূল হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

আল্লাহ তা‘আলা আরশের উপর

কুরআনের আয়াত, বিশুদ্ধ হাদিস, সত্যিকার জ্ঞান ও সঠিক স্বভাব প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা‘আলা আরশের উপরই আছেন। একজন মুসলিমের আক্বীদা বা বিশ্বাস এটিই হতে হবে। নিম্নে এর সপক্ষে কয়েকটি প্রমাণ উপস্থাপন করা হল।

১. আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ অর্থাৎ “আল্লাহ আরশের উপর উঠেছেন।” [সূরা ত্বাহা] استوى এর অর্থ উপরে উঠা এবং উন্নীত হওয়া। যেমনটি বুখারির বর্ণনায় তাবেয়ীদের থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

২. বিদায় হজের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার দিন যে ভাষণ দেন, তাতে তিনি বলেন, “আমি কি তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে আমার উপর অর্পিত রিসালাতের দায়িত্ব তোমাদের নিকট পৌছাইনি?” উপস্থিত সবাই সমস্বরে বললে, হ্যাঁ। তারপর তিনি তার আঙ্গুলকে *আসমানের দিকে উঁচু করলেন* এবং সমবেত লোকদের দিকে ঝুঁকিয়ে তাদের সম্বোধন করে বললেন, “হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক।” [মুসলিম]

৩. সালাতে মুসল্লিরা বলেন, سبحان ربي الأعلى “আমার সুউচ্চ রব কতই না পবিত্র!” অনুরূপভাবে দো‘আর সময় মানুষ আসমানের দিকেই হাত উঠায়। [এতেও এ কথা স্পষ্ট হয় যে, মহান আল্লাহ তা‘আলা উপরেই আছেন।]

৪. শিশুদের যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, আল্লাহ কোথায়? তখন সে স্বভাবতই বলে, আল্লাহ আসমানে অথবা ইশারা করে আসমানের দিকে দেখায়।

৫. মহান আল্লাহ তা‘আলা বলেন, {وَهُوَ اللهُ فِي السَّمَاوَاتِ} “ আর আল্লাহ, তিনি-তো আসমানসমূহে।” [সূরা আল-আন‘আম] আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, তাফসীরবিদগণ এ বিষয়ে ঐকমত পোষণ করেন যে, পথভ্রষ্ট দল জাহমিয়ারা যে কথা বলে, আমরা তা বলবো না। তারা বলে ‘আল্লাহ তা‘আলা সর্বত্র বিরাজমান’, অথচ মহান আল্লাহ তা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। আর في السموات বা আল্লাহ আসমানে এ কথার অর্থ হল على السموات- আল্লাহর আসমানের উপর। তবে মহান আল্লাহ তা‘আলা আমাদের দেখেন, আমাদের কথা শোনেন, যদিও তিনি আরশের উপর অবস্থান করছেন।

অসাধারণ উপদেশমূলক কাহিনী

এ বিষয়ে হাদিসে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে:—

عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال : « وكانت لي جارية ترعى غنماً لي قبل «أحد والجوانية» فاطلعت ذات يوم ، فإذا بالذئب قد ذهب بشاة من غنمها ، وأنا رجل من بني آدم ، آسف كما يأسفون ، لكني صككتها صكة ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليّ ، قلت يا رسول الله ، أفلا أعتقها ؟ قال : أئتني بها ، فقال لها : أين الله ؟ قالت في السماء ، قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله ، قال : أعتقها فإنها مؤمنة » .

অর্থ, মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম আস-সুলামী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার একজন বাঁদী ছিল, সে ওহুদ পাহাড়ের প্রান্তে আমার ছাগল চড়াত। একদিন সে বাড়িতে আসলে, তখন একটি নেকড়ে বাঘে এসে আমার একটি ছাগল ধরে নিয়ে যায়। আর আমি যেহেতু একজন আদম সন্তান— মানুষ, এতে স্বভাবতই অন্যান্য মানুষের মত আমিও খুব কষ্ট পেলাম। ফলে আমি বাঁদীটিকে সজোরে একটি প্রহার করলাম। পরবর্তীতে বিষয়টি আমাকে ব্যথিত করলে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাকে আজাদ করে দেব? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি তাকে আমার নিকট নিয়ে আস। তারপর আমি তাকে নিয়ে এলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করল, "আল্লাহ কোথায়?" উত্তরে সে বলল, "আল্লাহ আসমানে।" তারপর জিজ্ঞাসা করল, "আমি কে?" সে বলল, "আপনি আল্লাহর রাসূল।" তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলল, "তুমি তাকে আজাদ করে দাও, কারণ সে মুমিন।" [মুসলিম ও আবু দাউদ] ('আসমানে' অর্থ হলো 'আসমানের উপরে')।

হাদিসের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ:

১. ছোট হোক অথবা বড় হোক যে কোন ধরনের সমস্যায় সাহাবীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে তার সমাধান করত, যাতে তারা এ বিষয়ে আল্লাহর বিধান কী তা জানতে পারে।

২. আর বিচার ফায়সালার জন্য আল্লাহ ও তার রাসূলের নিকটই যেতে হবে। আল্লাহ ও তার রাসূলকে বাদ দিয়ে কারো নিকট বিচার ফায়সালার জন্য যাওয়া কোন ঈমানদারের কাজ হতে পারে না। কারণ, মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআনে করীমে বলেন,

﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ .

"আমি আপনার রবের শপথ করে বলছি, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের বিবাদ মীমাংসায় আপনাকে ফায়সালাকারী না বানায়। অতঃপর আপনি যে ফায়সালা দিয়েছেন, তাতে তাদের অন্তরে কোন প্রকার সংকীর্ণতা না থাকে এবং তারা পুরোপুরি আত্মসমর্পন করে।" [সূরা আন-নিসা: ৬৫]

৩. বাঁদীটিকে প্রহার করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করেন নি, শুধু তাই নয়, বিষয়টি তার নিকট খুব কষ্টকর ও দুঃখনীয় ছিল।

৪. হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাধারণত মুমিনদেরই আজাদ করে দেয়া হয়, কাফেরদের নয়। কারণ, এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে বাঁদীটির পরীক্ষা করেছেন। তারপর যখন তিনি তার ঈমানের বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত হলেন, তখন তাকে আজাদ করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আর যদি কাফের হত, তাহলে তিনি তাকে আজাদ করতে নির্দেশ দিতেন না।

৫. এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, তাওহীদ বিষয়ে মানুষের নিকট জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। আর আল্লাহ তা'আলা যে, আরশের উপর তা প্রতিটি মুমিন মুসলিমের জানা থাকা আবশ্যক।

৬. 'আল্লাহ কোথায়?' এ বলে কাউকে জিজ্ঞাসা করা যে সুন্নত তা এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। কারণ, এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ কোথায়? এ বলে বাঁদীটিকে জিজ্ঞাসা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা আসমানে! এ বলে উত্তর দেওয়া যে বৈধ তা এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ উত্তরের উপর স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং

কোন প্রকার আপত্তি করেননি। এ ছাড়া উত্তরটি আল্লাহ তা'আলার বাণীর অনুরূপ। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন,

﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾.

"যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদেরসহ জমিন ধসিয়ে দেয়া থেকে কি তোমরা নিরাপদ হয়ে গেছ, অতঃপর আকস্মিকভাবে তা থরথর করে কাঁপতে থাকবে।"

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, তিনি হলেন, মহান আল্লাহ তা'আলা।

আর আয়াতে في السماء কথাটির অর্থ على السماء - আসমানের উপর।

৭. একজন মানুষের ঈমান তখন বিশুদ্ধ হবে, যখন সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রিসালাত বিষয়ে সাক্ষী প্রদান করবে। আল্লাহর উপর ঈমান আনল, অথচ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে স্বীকার করল না, তাহলে সে ঈমানদার হতে পারবে না।

৮. মহান আল্লাহ তা'আলা আসমানে এ কথার উপর বিশ্বাস করা, প্রমাণ করে যে, তার ঈমান সঠিক ও নির্ভেজাল। আর এ বিষয়ের উপর বিশ্বাস করা প্রতিটি মুমিনের আবশ্যক।

৯. এ হাদিস দ্বারা তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করা হল, যারা বলে মহান আল্লাহ সশরীরে সর্বত্র বিরাজমান। তাদের কথাটি ঈমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সত্যি কথা হল, আল্লাহ তা'আলা আসমানে। তবে তার জ্ঞান আমাদের সাথে আছেন এবং তার ইলম বা জ্ঞান আমাদের পরিবেষ্টন করে আছেন, তিনি সশরীরে আমাদের সাথে নাই। তার ইলম ও কুদরাত সর্বত্র বিরাজমান। যারা বলে 'আল্লাহ তা'আলা সশরীরে সর্বত্র বিরাজমান' তাদের কথা ভ্রান্ত ও ভুল।

১০.রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাদীটিকে পরীক্ষা করার জন্য তার নিকট নিয়ে আসার জন্য যে, নির্দেশ দিয়েছেন, তা প্রমাণ করে যে, তিনি গায়েব জানেন না। যদি গায়েব জানতেন তাহলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা না করেই ফায়সালা দিতে পারতেন। এ হাদিস দ্বারা সূফীদের দাবীও বাতিল বলে প্রমাণিত হয়; কারণ, তারা বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানে। প্রকৃত সত্য হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন গায়েব জানেন না। এ কারণে মহান আল্লাহ তা'আলা তার নবীকে নির্দেশ দেন যে,

﴿قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

“হে রাসূল! আপনি বলুন, আমি আমার নিজের জন্যও উপকার ও ক্ষতির নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম নই। তবে আল্লাহ্ যা চায়। আর আমি যদি গায়েব জানতাম, তবে অধিক কল্যাণ লাভ করতাম আমাকে কোন ক্ষতি স্পর্শ করত না। আমি-তো শুধু মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ-দানকারী।”

পিতা-মাতা ও সন্তানের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপদেশ:

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته ، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راعية ، وهي مسؤولة عن رعيتها ، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته »

অর্থ, "তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল! তোমাদের সকলকে তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। একজন ইমাম সে অবশ্যই একজন দায়িত্বশীল, তাকে অবশ্যই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। একজন পরিবারের কর্তা সে তার পরিবারের দায়িত্বশীল। তাকে অবশ্যই তার পরিবারের যারা তার অধীনস্থ তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। একজন মহিলা সে তার স্বামীর ঘরে দায়িত্বশীল, তাকে অবশ্যই তার অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। আর একজন চাকর সে তার মালিকের ধন-সম্পদের দায়িত্বশীল! তাকে তার দায়িত্বের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে।" [বুখারী, মুসলিম]

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ কি? তিনি উত্তরে বললেন,

« أن تجعل لله نداً وهو خلقك ، قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ، قلت : ثم أي ، قال : أن تزني بحليلة جارك».

"আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যে আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" আমি বললাম, তারপর মারাত্মক অপরাধ কোনটি? তিনি বললেন, "তোমার সন্তান তোমার সাথে খাবে এ ভয়ে তুমি তাকে হত্যা করলে।" আমি বললাম, তারপর মারাত্মক অপরাধ কোনটি? তিনি বললেন, "তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করলে।" [বুখারী, মুসলিম]

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের বিষয়ে ইনসাফ কর।" [বুখারী, মুসলিম] অর্থাৎ, তোমাদের সন্তানদের বিষয়ে তাদের ধন-সম্পত্তিতে, অনুদানের ক্ষেত্রে ও যাবতীয় সব বিষয়ে তুমি ইনসাফ কর।

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« كل مولود يولد على الفطرة ، فأبوه يهودانه ، أو ينصرانه ، أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة ، هل ترى فيها جدعاً» .

"প্রতিটি নবজাত শিশু ফিতরাত তথা ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে, তারপর তার পিতা তাকে ইয়াহুদি বানায়, খ্রিষ্টান বানায়, অথবা অগ্নি-উপাসক বানায়। যেমন, চতুষ্পদ জন্তু সে একটি জন্তু জন্ম দেয়, কিন্তু তার মধ্যে কোনটিকেই তুমি কান কাটা দেখতে পাবে না।" [বুখারী]

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ,

« من الكبائر أن يشتم الرجل والديه ، يسب أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه » .

"কবিরা গুনাহের একটি বড় ধরনের কবিরা গুনাহ হল, কোন লোক তার মাতা-পিতাকে গালি দেওয়া। যেমন, সে কোন লোকের পিতাকে গালি দিল, তখন লোকটিও তার পিতাকে গালি দিল অথবা সে অন্যের মাকে গালি দিল এবং সে লোকও তার মাকে গালি দিল।" [বুখারী, মুসলিম]

৬. এক লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসে জিজ্ঞাসা করে বলল,

« يا رسول الله ، من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال ثم من ؟ قال : أبوك » .

হে আল্লাহর রাসূল! আমি সর্বোত্তম ব্যবহার কার সাথে করব? তিনি বললেন, "তোমার মায়ের সাথে।" সে বলল, তারপর কার সাথে? তিনি বললেন, "তোমার মায়ের সাথে।" তারপর লোকটি বলল, তারপর কার সাথে? তিনি বললেন, "তোমার মায়ের সাথে।" সে বলল, তারপর কার সাথে? তিনি বললেন, "তোমার পিতার সাথে।" [বুখারী, মুসলিম]

মাতা-পিতা ও অভিভাবকদের দায়িত্ব:

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"হে ঈমানদারগণ তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা কর।" একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, পিতা-মাতা, অভিভাবক ও সমাজের দায়িত্বশীলদের নতুন প্রজন্মের শিশু, কিশোর ও যুবকদের শিক্ষা-দীক্ষা বিষয়ে অবশ্যই আল্লাহর সম্মুখে জবাবদিহি করতে হবে। তারা যদি তাদের ভালো শিক্ষা দিয়ে থাকে, তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতে তারা নিজেরাও সফল হবে এবং নতুন প্রজন্মও সফল হবে। আর যদি তারা তাদের শিক্ষা দিতে অলসতা করে, তখন তারাও তার পরিণতি ভোগ করবে এবং তাদের অপরাধের শাস্তি তাদেরও ভোগ করতে হবে। কারণ, হাদিসে বলা হয়েছে, كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته . তোমরা সবাই দায়িত্বশীল তোমাদের সবাইকে তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

হে অভিভাবক বা শিক্ষক! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী আপনাদের জন্য সুখবর! কারণ, তিনি বলেন,

فوالله لان يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم

"তোমার দ্বারা যদি একজন মানুষকেও হেদায়েত দেয়া হয়, তা তোমার জন্য আরবের সবচেয়ে মূল্যবান উট লাল উট হতেও উত্তম।"

আর আপনারা যারা মাতা-পিতা হয়েছেন, আপনাদের জন্য সু-সংবাদ হল, রাসূলের বিশুদ্ধ হাদিস.. তিনি বলেন,

« إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعوا له» .

"মানুষ যখন মারা যায় তিনটি আমল ছাড়া আর সব আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তিনটি আমল হল, সদকায়ে জারিয়া, এমন ইলম যার দ্বারা জাতি উপকৃত হয়, অথবা নেক সন্তান যারা তার মৃত্যুর পর তার জন্য দোয়া করে।"

কাজেই হে অভিভাবক! প্রথমে আপনি আপনার নিজের আমলকে সুন্দর করতে চেষ্টা কর। আপনি যা করেন তাই শিশুদের নিকট ভালো কাজ আর আপনি যে সব কাজ করা ছেড়ে দেবেন, তাই হল, শিশুদের নিকট খারাপ কাজ। মাতা-পিতা ও অভিভাবকরা শিশুদের সামনে ভালো কাজ করাটাই হল, তাদের জন্য অতি উত্তম শিক্ষা, এর চেয়ে উত্তম আর কোন শিক্ষা হতে পারে না।

অভিভাবক ও শিক্ষকদের কর্তব্য:

১. শিশুদের لا إله إلا الله ، محمد رسول الله দ্বারা কথা শিখানো। আর শিশুরা যখন বড় হবে তখন তাদের এ কালিমার অর্থ শেখাবে। কালিমার অর্থ হল, "আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নাই, তার কোন শরিক নাই।"

২. শিশুর অন্তরে আল্লাহর মহব্বত ও আল্লাহর প্রতি ঈমানের বীজ জীবনের শুরুতেই বপন করে দিতে হবে। কারণ, আল্লাহই আমাদের স্রষ্টা, রিযিকদাতা ও আমাদের সাহায্যকারী; তিনি একক তার কোন শরীক নাই।

৩. শিশুদের এ কথা শিখানো যে, তারা যেন সব সময় সবকিছু আল্লাহর নিকটই চায় এবং সাহায্যের প্রয়োজন হলে, আল্লাহর নিকটই চায়। কারণ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে বলেন,

« إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله» .

"যখন কোন কিছু চাইবে তখন তুমি আল্লাহর নিকট চাইবে, আর যখন কোন সাহায্য চাইবে তখনও আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে।" [তিরমিযী]

নিষিদ্ধ কাজ হতে শিশুদের দূরে রাখা:-

১. শিশুদের কুফর, শিরক, গালি দেয়া, অভিশাপ দেয়া ও অনৈতিক কথা-বার্তা বলা হতে বিরত রাখা। তাদের সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেয়া যে, কুফর হল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারণ, তা মানুষকে ক্ষতির দিকে নিয়ে যায় এবং জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হয়। আর আমাদের উপর কর্তব্য হল, আমরা তাদের সামনে আমাদের জবানকে হেফাজত করব, তাদের সামনে কখনোই বাজে কথা বলব না, যাতে আমরা তাদের জন্য অনুকরণীয় ও আদর্শ হতে পারি।

২. আল্লাহর সাথে শিরক করা হতে বিরত থাকতে হবে। যেমন, মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন মৃত ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করা, তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া ও আরোগ্য লাভের জন্য তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া। অথচ, তারা মহান আল্লাহরই বান্দা, কোন ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ﴾

অর্থ, "আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন বস্তুকে ডেকো না; যা তোমার উপকার ও ক্ষতি করতে পারে না। তারপরও যদি তুমি তাই কর, তখন অবশ্যই তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

৩. তাস, জুয়া, লটারি, বাজি ইত্যাদি হতে শিশুদের দূরে রাখতে হবে, কখনোই তাদের সামনে এগুলো পেশ করা যাবে না, যদিও এগুলো দিয়ে তাদের সান্ত্বনা বা খুশি করার জন্য হয়। কারণ, তা মানুষকে জুয়ার দিকে নিয়ে যায় এবং মানুষের মধ্যে রেষারেষি ও দুশমনি সৃষ্টি করে। এগুলো শিশুদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, এগুলোর কারণে তাদের সময় নষ্ট, মালামাল অপচয়, পড়ালেখার ক্ষতি ও তাদের সালাত নষ্ট করার কারণ হয়। অনেক সময় এসবের মধ্যে মগ্ন হওয়ার কারণে অন্য দিকে আর মনোযোগ দিতে পারে না।

৪. তাদের অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, উলঙ্গ ছবি সম্বলিত ম্যাগাজিন, মিথ্যা বানোয়াট গোয়েন্দা উপন্যাস বা গল্পের বই পড়া হতে অবশ্যই বিরত রাখতে হবে। অশ্লীল সিনেমা, টেলিভিশন ও সিডি, বি-সিডি যাতে না দেখে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ, এ গুলো সবই তাদের আখলাক-চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতার জন্য হুমকি ও ভবিষ্যতের অত্যন্ত ক্ষতিকর।

৫. শিশুদের ধুমপান হতে দূরে রাখতে হবে। আর তাদের এ কথা বুঝাতে হবে, সমস্ত ডাক্তাররা এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করে যে, ধুমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, ধুমপানে ক্যানসার হয়, রক্তকে দূষিত করে, দাঁত নষ্ট করে, দুর্গন্ধ ছড়ায় ও ধুমপান মানুষের হার্ডের জন্য ক্ষতিকর। ধুমপান মানব দেহের কোন উপকারে আসে না। সুতরাং, ধুমপানের বেচা-কেনা ও পান করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। শিশুদের ধুমপানের বিকল্প হিসেবে ফল-মূল ইত্যাদি খেতে উপদেশ দেবেন।

৬. সত্য কথা বলা ও সত্য পথে চলার জন্য তাদের অভ্যস্ত করবেন। আমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে হলেও তাদের সামনে মিথ্যা কথা বলবো না। আর আমরা যখন তাদের কোন ওয়াদা দেবো তা পূরণ করবো। হাদিসে বর্ণিত আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ,

«آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان» .

অর্থ, “মুনাফেকের আলামত তিনটি: যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, আর যখন ওয়াদা করে খেলাফ করে, আর যখন তার নিকট আমানত রাখা হয়, তখন সে তার খেয়ানত করে।” [বুখারী, মুসলিম]

৭. আমরা আমাদের শিশুদের হারাম খাদ্য হতে খাওয়াবো না। যেমন, সুদ, ঘুষ ও চুরি ডাকাতি ইত্যাদির পয়সা দ্বারা তাদের বড় করবো না। কাউকে ধোঁকা দিয়ে উপার্জিত সম্পদ হতে তাদের কিছু কিনে দেবো না। কারণ, এ সব হল, সন্তান অবাধ্য, অসভ্য ও বেআদব হওয়ার কারণ।

৮. শিশুদের আদর যত্ন ও স্নেহ মমতা দিয়ে লালন-পালন করবে। তাদের সাথে কখনো কোন প্রকার খারাপ ব্যবহার করা উচিত না। তাদের ধ্বংসের জন্য অভিশাপ দেয়া হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। কারণ, ভালো দোয়া ও খারাপ দোয়া সবই গ্রহণ করা হতে পারে। এতে কোন কোন সময় তাদের গোমরাহি আরও বৃদ্ধি পায়। তবে উত্তম হল, আমরা শিশুদের বলব, মহান আল্লাহ তোমার সংশোধন করুক।

সালাত কীভাবে আদায় করতে হয় তা শিক্ষা দেয়া:-

১. শিশু ছেলে-মেয়েদের ছোট বেলাতেই সালাত কীভাবে আদায় করতে হয়— তা শিক্ষা দেবেন, যাতে বড় হলে সালাত আদায় করতে অভ্যস্ত হয়। যেমন, বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ,

«علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعاً ، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا ، وفرقوا بينهم في المضاجع».

"তোমরা তোমাদের শিশুদের সাত বছর বয়সে সালাতের তালীম দাও। আর যখন দশ বছর হয়, তখন তোমরা তাদের সালাত আদায় না করার কারণে প্রহার কর। আর তোমরা তাদের বিছানা আলাদা করে দাও।" [আল-জামে' আস-সহীহ] তাদের ওজু করে দেখাবে, তাদের সামনে সালাত আদায় করে, তাদের দেখাবে। তাদের নিয়ে মসজিদে যাবে। যে বই পুস্তকে সালাতের নিয়মাবলী আছে, তা তাদের পড়তে দেবে, যাতে তাদের উসিলায় পরিবারের সবাই শিখতে পারে। তাদের সালাত আদায়ের নিয়ম শিখানো, মাতা-পিতা ও অভিভাবকের নৈতিক দায়িত্ব। তারা যদি দায়িত্ব পালনে অলসতা করে, মহান আল্লাহ তাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবে।

২. শিশুদের কুরআন শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথমে সূরা ফাতেহা শিক্ষা দিবেন। তারপর ছোট ছোট সূরা গুলো শিক্ষা দিবেন। সালাতে পড়ার জন্য আত্-তাহিয়্যাতু শেখাতে হবে। আর যদি মাতা-পিতা সময় না পায়, তবে তাদের জন্য বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষা, কুরআন হিফয করা ও হাদিস মুখস্থ করা ইত্যাদির জন্য একজন শিক্ষকের ব্যবস্থা করবে, যিনি তাদের বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত ও সালাতের তালীম দেবে।

৩. শিশুদের জুমার সালাতে উপস্থিত হতে অনুমতি দেবেন, মসজিদের সালাতের জামাতে উপস্থিত হতে উৎসাহ প্রদান করবেন। তারা মসজিদের গিয়ে বড়দের পিছনে দাঁড়াবে। তারা যদি কোন ভুল করে, তবে তাদের খুব যত্ন সহকারে বুঝিয়ে বলবেন। তাদের কোন প্রকার ধমক দেবে না এবং তাদের সাথে চেঁচামেচি করবেন না। কারণ, যদি এ

কারণে সালাত ছেড়ে দেয়, মসজিদে আসা বন্ধ করে দেয়, তাহলে আমরা গুনাহগার হবো।

৫. ছোট শিশুরা যখন সাত বছর হবে, তখন তাদের রোজা রাখার জন্য তালিম দেবেন, যাতে বড় হলে তাদের রোজা রাখতে কোন প্রকার কষ্ট না হয়।

পর্দা করার জন্য উৎসাহ দেয়া:

১. ছোট ছেলে মেয়েদের ছোট বেলা থেকেই পর্দা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করবে, যাতে তারা বড় হলে পর্দাকে অপরিহার্য মনে করে। তাদের কখনোই ছোট বা পাতলা কাপড় পরিধান করাবে না এবং মেয়েদের পুরুষদের মত এক কাপড় পরিধান করাবে না। কারণ, এ হল কাফের-বেদ্বীনদের স্বভাব, এতে যুব সমাজ ফিতনার মুখোমুখি হয় এবং এ ধরনের পোশাক পরিধান করা তাদের চারিত্রিক অধঃ:পতনের কারণ হয়। আমাদের কর্তব্য হল, আমরা আমাদের মেয়েদের বয়স যখন সাত বছর হবে, তখন থেকে বাধ্য করব, তারা যাতে তাদের মাথাকে ওড়না দিয়ে ডেকে রাখে। আর যখন সে প্রাপ্তবয়স্ক হবে, তখন তাকে অবশ্যই চেহারাও ডেকে রাখতে হবে। কালো পোশাক বা বোরকা পরার জন্য তাদের নির্দেশ দিতে হবে। কুরআন সব নারীদের পর্দা করার প্রতি উদাত্ত আহ্বান করে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ ،

"হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে কন্যাদেরকে ও মুমিনদেরকে বল, তারা যেন তাদের জিল-বাবের কিছু অংশ নিজদের উপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা হবে।ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" [সূরা আল-আহযাব: ৫৯]

মহান আল্লাহ তা'আলা নারীদের জাহিলিয়্যাতের যুগের মত সাজ-সজ্জা অবলম্বন করতে এবং ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ .

অর্থ, "আর তোমরা তোমাদের নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না।" [সূরা আল-আহযাব: ৩২-৩৩]

২. শিশুদের এমন কাপড় পরাতে হবে, যাতে মেয়েদের পোশাক তাদের ছেলেদের পোশাক হতে সম্পূর্ণ আলাদা হয়। আর তারা যেন অশালীন ও বেমানান পোশাক পরিধান করা হতে বিরত থাকে। একেবারে চিপা, সংকীর্ণ ও পাতলা কাপড় যাতে শরীর দেখা যায়, এ ধরনের পোশাক পরিধান হতে বিরত থাকবে। বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের থেকে যারা পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য রাখে তাদের এবং পুরুষদের থেকে যারা নারীদের সাথে সাদৃশ্য রাখে তাদের অভিশাপ করেছেন। আর তিনি পুরুষদের থেকে যারা নারীদের ভেশ-ভুসা অবলম্বন করে এবং নারীদের থেকে যারা পুরুষদের ভেশ-ভুসা অবলম্বন করে তাদের অভিশাপ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« من تشبه بقوم فهو منهم» .

“যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের লোকের সাথে সাদৃশ্য রাখে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।” [আবু দাউদ]

আদব আখলাক শিক্ষা দেয়া:

১. শিশুদের উত্তম আচার-ব্যবহার শেখাবে। তাদের খানা-পিনা, দেওয়া-নেওয়া ইত্যাদিতে ডান হাত ব্যবহার করার অভ্যাস করাবে। খাওয়া-দাওয়া যাতে দাঁড়িয়ে না করে বসে করে, সে জন্য তাকে তার জীবনের শুরু থেকেই শিক্ষা দেবে। যে কোন কাজের শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ পড়তে বলবে, আর শেষে ‘আলহামদু-লিল্লাহ’ বলতে তালীম দেবে।

২. শিশুদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। তাদের হাত পায়ের নখগুলো কেটে দিতে হবে। মিসওয়াক করার ব্যাপারে তাদের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। খাওয়ার আগে ও পরে হাত ধোয়ার নিয়ম শিখিয়ে দিবে। পাক-পবিত্রতা কীভাবে অর্জন করতে হয়, তা শিখাতে হবে। পেশাব পায়খানার পর ঢিলা কুলুখ বা টিস্যু পেপার ব্যবহারের পদ্ধতি শেখাবে। তারা যাতে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ নাপাক করে না ফেলে, সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন নিতে হবে।

৩. যদি তাদের থেকে কোন ভুল প্রকাশ পায়, তাহলে আমরা গোপনে তাদের উপদেশ দেবো, মানুষের সামনে কোন প্রকার লজ্জা দেবো না। তারপরও যদি তারা তাদের অন্যায়ের উপর অটল থাকে, তাহলে তার সাথে তিন দিন পর্যন্ত কথা-বার্তা বলা ছেড়ে দেবো, তিন দিনের বেশি নয়।

৪. আযানের সময় শিশুদের চুপ থাকতে বলব এবং তাদেরকে মুয়াজ্জিনের সাথে আযানের বাক্যগুলো শিখিয়ে দিবে। আযান শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর

সালাত আদায় করবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট ওসিলা কামনা করবে।

« اللّهُمَّ رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، آت محمد الوسيلة والفضيلة ، وأبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته» .

অর্থ, "হে আল্লাহ! তুমিই এ পরিপূর্ণ আহ্বান ও শাশ্বত সালাতের প্রকৃত মালিক। তুমি দাও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মানিত স্থান ও মহা মর্যাদা। আর তাকে তুমি পৌঁছে দাও প্রশংসিত স্থান যার ওয়াদা তুমি তাকে দিয়েছ।"

৫. প্রতিটি শিশুর জন্য বিছানা আলাদা করে দিতে যথা সম্ভব চেষ্টা করবে। আর তা যদি সম্ভব না হয়, কমপক্ষে প্রত্যেকের জন্য আলাদা খাতা কম্বল ও লেপের ব্যবস্থা করতে। আর উত্তম হল, মেয়েদের জন্য একটি কামরা আর ছেলেদের জন্য একটি কামরা নির্ধারণ করে দেয়া, যাতে তাদের চরিত্র ভালো ও কলঙ্কমুক্ত থাকে।

৬. তারা যাতে ময়লা আবর্জনা যেখানে সেখানে না ফেলে, সে জন্য তাদের বোঝাতে হবে। আর রাস্তা থেকে যে কোন ধরনের কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে রাখার ব্যাপারে তাদের উৎসাহ দিতে হবে।

৭. খারাপ ছেলেদের সাথে যাতে না মিশে, এ বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে।

৮. শিশুদের সালাম দেয়ার বিষয়ে তালীম দিতে হবে। ঘরে প্রবেশের সময়, রাস্তায় চলাচলের সময়, মানুষের সাথে দেখা হলে السلام عليكم ورحمة الله وبركاته বলে সালাম দেবে।

৯. প্রতিবেশীদের সাথে ভালো ব্যবহার করার প্রতি তাদের উপদেশ দেবে এবং তাদের যাতে কোন প্রকার কষ্ট না দেয় তার জন্য বিশেষ সতর্ক করবে।

১০.শিশুদের মেহমানের মেহমানদারি করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। মেহমানের সম্মান প্রদর্শন, মেহমানের জন্য মেহমানদারি পেশ করার অভ্যাস গড়ে তুলবে।

জিহাদ ও সাহসিকতা:

১. পরিবারের লোকদের মিলিয়ে একটি মজলিশের আয়োজন করবে। তাতে পরিবারের সদস্যদের ও ছাত্রদের নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীদের জীবনী পড়ে শোনাবে। যাতে তারা জানতে পারে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন একজন সত্যিকার সাহসী নেতা আর তার সাহাবী আবু বকর রা., ওমর রা., ওসমান রা., আলী রা. ও মুয়াবিয়া রা. -সহ আরও অন্যান্য সাহাবীর ইসলামী দুনিয়াকে মুসলিমদের জন্য বিজয়ী করেন। আর তারাই ছিল আমাদের হেদায়েত ও

মুক্তিলাভের অন্যতম কারণ। তারা তাদের ঈমান, কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন যাপন, উন্নত চরিত্র ও সাহসিকতার কারণে সারা দুনিয়াতে বিজয় লাভ করে।

২. শিশুদের সাহসের অনুশীলন করাতে হবে। ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ ব্যাপারে তাদের উৎসাহ দিতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে যে, তারা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় না পায়। তবে তাদের মিথ্যা, ভ্রান্ত কথা-বার্তা ও অন্ধকার দিয়ে ভয় দেখানো বৈধ হবে না।

৩. আমাদের শিশুদের অন্তরের ইয়াহুদী ও জালিমদের থেকে প্রতিশোধ নেয়ার স্পৃহা জাগ্রত করবে। আমাদের জওয়ানরা যখন ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত হবে তখন আল্লাহর রাহে জিহাদের মাধ্যমে অবশ্যই ফিলিস্তিন ও বাইতুল মুকাদ্দাসকে ইয়াহুদীদের হাত থেকে মুক্ত করবে। মহান আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাদের সাহায্য করবে এবং বিজয়দান করবে।

৪. তাদের জন্য শিক্ষণীয় ও উপদেশমূলক বই ক্রয় করবে। যাতে তারা তা থেকে কিছু শিখতে পারে। যেমন, আল-কুরআনের কাহিনী সমগ্র, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনী, সাহাবীদের জীবনী, সালাহ উদ্দিন আইউবীর জীবনী, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আক্বীদা ইত্যাদি।

শিশুদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করা

১. নোমান ইবনে বাশীর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

« تصدق عليَ أبي ببعض ماله ، فقالت أمي – عمرة بنت رواحة – لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال لا ، قال اتقوا الله ، واعدلوا بين أولادكم» .

"আমার পিতা তার সম্পত্তির কিছু অংশ আমাকে দান করে দেন, তখন আমার মা উমরা বিনতে রাওয়াহা বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জানানো ছাড়া আমি আমার সদকার উপর রাজি হব না। তারপর বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হল। তিনি জানার পর বললেন, তুমি তোমার সব সন্তানদের কি এভাবে দান করেছ? সে বলল, না, তারপর তিনি বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং সন্তানদের মাঝে ইনসাফ কর।" [বুখারী, মুসলিম]

অপর এক বর্ণনাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, فلا تشهدوني إذاً ، فإني لا أشهد على جور অর্থাৎ, "তাহলে তুমি আমাকে এ বিষয়ে সাক্ষী বানাবে না, কারণ, আমি অন্যায় কাজের উপর সাক্ষী হতে পারি না।" [মুসলিম, নাসায়ী]

২. হে মুসলিম ভাইয়েরা! তোমরা কখনোই সন্তানদের বিষয়ে বে-ইনসাফ করবে না। তাদের বিষয়ে যদি তোমরা কোন কিছু দান করা অথবা তাদের কারো বিষয়ে যদি তোমরা ওসিয়াত কর, তাহলে তা তোমরা ইনসাফের ভিত্তিতে কর। সন্তানদের থেকে কাউকে বঞ্চিত করো না। বরং, সবচেয়ে ভালো হয়, আল্লাহ তা'আলা যা নির্ধারণ ও বণ্টন করেছে, তার উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করা। মনে চাইলে কোন সন্তানকে অন্যদের উপর অধিক প্রাধান্য দেয়া যাবে না। এ ধরনের কোন কাজ করলে মনে রাখবে, তুমি তোমাকে আগুনে পেশ করলে। এ ধরনের অনেক ঘটনা পাওয়া যায়, পিতা তার কোন সন্তানের জন্য ধন-সম্পত্তি লিখে দেয়ার ফলে তাদের মধ্যে বিরোধ, মারামারি ও হানাহানি চরম পর্যায়ে পৌঁছে। ফলে একে অপরে মামলা-মুকাদ্দিমা করতে তাদের মূল ধন ও আর অবশিষ্ট থাকে না।

যুব-সমাজের সমস্যার সমাধান

যুবকদের সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান হল, যদি তারা স্ত্রীদের ভরণ পোষণ ও মোহরানা আদায়ে সক্ষম হয়, তাহলে তাদের বিবাহ দিয়ে দেয়া। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» .

"হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্য হতে যাদের সামর্থ্য আছে, তারা যেন বিবাহ করে। কারণ, তা চক্ষুর জন্য শীতলতা ও লজ্জা স্থানের সংরক্ষণ। আর যে সামর্থ্য রাখে না, সে যেন রোজা রাখে, কারণ, রোজা রাখা তার জন্য প্রবৃত্তি-নিরোধক।" [বুখারী, মুসলিম] পড়ালেখা শেষ না করা বিবাহের জন্য কখনোই প্রতিবন্ধক নয়। বিশেষ করে, যখন সে কোন ধনী পরিবারের সন্তান হয়ে থাকে অথবা তার পিতা তার প্রয়োজনীয় খরচ বহন করার সামর্থ্য রাখে অথবা ছেলের নিকট সম্পদ থাকে বা তার চাকুরীর ব্যবস্থা থাকে, তখন বিবাহ করতে কোন বাধা নাই। বরং বিবাহ করে ঘর সংসার করাই তার জন্য মহৎ কাজ।

পিতার দায়িত্ব হল, ছেলে যখন বিবাহের বয়স হবে, তখন তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিবাহ দিয়ে দেয়া। বিশেষ করে, যখন পিতা ধনী হয়, তখন সে তার ছেলেকে বিবাহ করাতে কোন প্রকার কালক্ষেপণ করবে না। আর একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবে, যুবক ছেলে কোন প্রকার অশ্লীল কাজে জড়িত হওয়ার চেয়ে, তাকে বিবাহ দিয়ে দেয়া অধিক উত্তম। কারণ, যদি কোন অশ্লীল কাজে জড়িত হয়, তখন সমাজে সে অপমানিত হবে। আর ছেলেও যখন ধনী হয়, তখন সে নমনীয়তার সাথে তার পিতাকে বিবাহ দিয়ে দেয়ার জন্য আবেদন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে মাতা-পিতার পছন্দ ও তাদের সন্তুষ্টিকে অধিক গুরুত্ব দেয়া উচিত।

একটি কথা প্রতিটি মানুষের মনে রাখেতে হবে, মহান আল্লাহ তা'আলা যে কোন কিছুকে হারাম করেছে, তবে তার জায়গায় উত্তম একটি জিনিস হালাল করেছে। যেমন, মহান আল্লাহ তা'আলা সুদকে হারাম করছে, তার বিপরীতে ব্যবসাকে হালাল করেছেন, আর জিনাকে হারাম করছেন, তার বিপরীতে তিনি বিবাহকে হালাল করছেন। মোটকথা, যুবকদের সমস্যা সমাধানের সর্বোত্তম উপায় হল, বিবাহ।

আর যখন অভাবী হয়, মোহরানা, বা খরচা বহন করতে **অক্ষম হওয়ার কারণে যুবকের জন্য বিবাহ করা সম্ভব না হয়, তখন তার জন্য উত্তম চিকিৎসা নিম্নরূপ**:

১. **রোজা রাখা:** কারণ হাদিসে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء» .

"যে অক্ষম হয়, সে যেন রোজা রাখে। কারণ, রোজা রাখা তার জন্য প্রবৃত্তি-নিরোধক।" আর যে ব্যক্তি বিবাহ করতে অক্ষম, তার উপর রোজা রাখা আবশ্যক। কারণ, রোজা মানুষের যৌবনকে দমিয়ে রাখে এবং তাদের জন্য সাময়িক উপশম হয়। রোজা যুবকদের প্রবৃত্তিকে দুর্বল করে দেয়। তবে রোজা শুধু খানা-পিনা থেকে বিরত থাকার নাম নয় বরং, রোজা হল, নিষিদ্ধ বস্তুর দিকে তাকানো, মেয়েদের সাথে উঠবস করা, অশ্লীল সিনেমা, নাচ-গান শোনা ও নাটক দেখা এবং অশ্লীল উপন্যাস ও গল্পের বই পড়া হতে বিরত থাকা সহ যাবতীয় অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকা হল রোজা। আর যুবকদের উচিত হল, তারা তাদের চক্ষুর হেফাজত করবে, কানের হেফাজত করবে এবং মাথা-বনত করে রাস্তায় চলাফেরা করবে। কারণ, মহান আল্লাহ তা'আলা সংযমের মধ্যেই সমাধান রেখেছেন। প্রবৃত্তির পূজা করার মধ্যে তিনি কোন সমাধান রাখেন নি, বরং তাতে তিনি রেখেছেন বিপদ ও সমস্যা ।

২. **উন্নত হওয়া ও উত্তম আদর্শ গ্রহণ করা:**

মনোবিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেন যে, মানুষের মধ্যে সুপ্ত যৌননাভূতি বা মানুষের যৌন প্রকৃতিকে উন্নীত ও নিয়ন্ত্রণ করা মানুষের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে নয়, বরং তা মানুষের ক্ষমতার আওতাধীন ও মানুষের দ্বারা তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। যদি তোমার বিয়ে করার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে তার অর্থ এ নয় যে, তোমাকে বিপথে যেতে হবে। বরং তুমি ইচ্ছা করলে উত্তম আদর্শ আঁকড়ে ধরতে পার। তুমি কখনো অশ্লীলতার কাছেও না গিয়ে থাকতে পার, তুমি সবকিছুর ঊর্ধ্বে থেকে উন্নত চরিত্রকেই অবলম্বন করতে পার। আর তা হল, তুমি আত্মিক সাধনার প্রতি অধিক চেষ্টা কর। এ ছাড়াও সালাত, সিয়াম, কুরআন তিলাওয়াত. জিকির, হাদিস অধ্যয়ন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনী, মহা-মনীষীদের জীবনী পাঠ ইত্যাদির প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করবে, তাতে তোমার মন আর খারাপ কাজের দিকে ধাবিত হবে না। অথবা কাজে মনোযোগ দেয়া, লেখালেখি ও গবেষণা করা, চিত্রাঙ্কন, ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকার মাধ্যমেও নিজেকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হতে হেফাজত করা যায়। বিভিন্ন ধরনের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, দৈহিক ব্যায়াম, হাস্যরস, রসিকতা ইত্যাদি মানুষকে খারাপ চিন্তা থেকে হেফাজত করে এবং অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হতে বিরত রাখে।

৩. **দৈহিক ব্যায়াম:** এটি হল, মানুষের দৈহিক পরিশ্রম। মানুষ যখন দৈহিক পরিশ্রম তথা ব্যায়াম করে, বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা ও অন্যায়-অনাচার মুক্ত সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে

অংশগ্রহণ করে, তখন মানুষের মধ্যে খারাপ কোন চিন্তা স্থান পায় না। তখন সে ব্যভিচার যা একজন যুবকের জন্য দৈহিক ও নৈতিক উভয়ের জন্য মারাত্মক পরিণতি ভয়ে আনে, থেকে নিজেকে হেফাজত করবে। একজন যুবক যখনই তার প্রবৃত্তির চাপ অনুভব করবে, তখন সে যখন দৈহিক পরিশ্রম করবে, তাতে তার যে অতিরিক্ত চাহিদাটি ছিল, তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। দীর্ঘ লম্বা দৌড়, ভারি বোঝা বহন, কুস্তি, প্রতিযোগিতা, যুদ্ধের ট্রেনিং, সাতার, সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা ইত্যাদি মানুষের প্রবৃত্তির চাহিদা কমিয়ে দেয়।

৪. **ইসলাম বিষয়ে বই-পুস্তক অধ্যয়ন করা:** সবচেয়ে উত্তম হল, কুরআন তিলাওয়াত করা, হাদিস ও তাফসীর পড়া, কুরআনের কিছু অংশ হেফজ করা ও হাদিস মুখস্থ করা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সীরাত সম্পর্কে জানা, খুলাফায়ে রাশেদীন, চিন্তাবিদ ও বড় বড় মনীষীদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানা। দ্বীনি মজলিশে অংশগ্রহণ করা, ইলমের আলোচনায় শরিক হওয়া, কুরআন তিলাওতের সিডি-ভিসিডি/রেডিও ইত্যাদি শোনা ।

মোট কথা, একজন যুবকের জন্য সর্বোত্তম চিকিৎসা হল, বিবাহ। আর তা যদি কোন কারণে সম্ভব না হয়, তাহলে উপর কর্তব্য হল, রোজা রাখা, দৈহিক পরিশ্রম করা, জ্ঞান অর্জন করা। আর জ্ঞান অর্জন হল শক্তিশালী ঠিকানা যা মানুষের উপকার করে; কষ্ট দেয় না। তারপর সর্বোত্তম চিকিৎসা হল, যে সবের প্রতি দেখতে মহান আল্লাহ তা‘আলা নিষেধ করেছেন, তা হতে চোখের হেফাজত করা। মহান আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রার্থনা করা যে, যাতে মহান আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য বিবাহকে সহজ করে দেয়।

গ্রহণযোগ্য দোয়া:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি রাতে ঘুমানোর সময় এ দোয়াটি পড়ে,

لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله

অর্থ ‘আল্লাহ ছাড়া আর কোন হক ইলাহ নাই, তিনি একক তারা কোন শরীক নাই। রাজত্ব তারই প্রশংসা ও তার। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন। আল্লাহ পবিত্র, সব প্রশংসা আল্লাহর, তিনি ছাড়া আর কোন হক ইলাহ নাই, তিনি সবচাইতে বড়। আল্লাহর তাওফিক ছাড়া কেউ কোন ভালো কাজ করতে পারে না। আর আল্লাহ যাকে তাওফিক দেয় তাকে বিরত রাখার কেউ নাই।’ তারপর সে বলে اللَّهُمَّ أغفر لي মহান আল্লাহ তা‘আলা তার দুয়া কবুল করেন। আর যদি সে ওযু করে এবং সালাত আদায় করে, আল্লাহ তা‘আলা তার সালাতকে কবুল করে।”

জন্ম নিয়ন্ত্রণের ক্ষতি:

১. মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} "সম্পদ ও সন্তান দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য।" ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি মহান আল্লাহ তা'আলার বহুত বড় নেয়ামত, যার প্রতি মানুষ স্বভাবতই ধাবিত ও আকৃষ্ট হয়ে থাকে। এ দুটি হল, মানুষের জন্য তাদের দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য, গৌরব ও সম্মান। তবে বর্তমানে শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে কিছু মানুষ শুধু তাদের সন্তানের হার কমিয়ে আনার প্রবণতা অবলম্বন করছে। স্বভাবতই তারা তাদের সম্পদকে কমানোর চেষ্টা কখনোই করে না। অথচ মাল ও সন্তান-সন্ততি হল, মানুষের দুনিয়া ও পরকালের জীবনের অমূল্য সম্পদ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له» .

অর্থাৎ, মানুষ যখন মারা যায়, তিনটি আমল ছাড়া তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, এক-ছদকা জারিয়া, দুই-উপকারী ইলম, তিন-নেক সন্তান যে তার মৃত্যুর পর তার জন্য দোয়া করে।

২. ইসলাম মানুষকে অধিক সন্তানলাভের প্রতি উৎসাহ দিয়েছে এবং যে সব নারীরা অধিক সন্তানের অধিকারী হয়ে থাকে, তাদের বিবাহ করতে নির্দেশ দিয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» .

"তোমরা অধিক সন্তানের অধিকারী ও স্বামীদের অধিক ভালোবাসে এ ধরনের মেয়েদের বিবাহ কর, কারণ, কিয়ামতের দিন আমি আমার উম্মত বেশি হওয়ার কারণে আল্লাহর দরবারে গর্ব করব।"

৩. মনে রাখতে হবে, ইসলাম শুধু মাত্র স্ত্রী রোগী হওয়ার কারণে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করার অনুমতি দিয়েছে। যদি কোনো মুসলিম ডাক্তার বলে যে, এ মহিলা সন্তান নিলে তার জীবনের জন্য তা হুমকি হবে, তখন তার জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা বৈধ হতে পারে। এ ছাড়া অন্য যে সব কারণে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা হয় যেমন, অভাব, লালন-পালন করতে না পারা, পড়া-লেখা করাতে অক্ষম হওয়া, নারীদের জন্য ক্ষতিকর ইত্যাদি— এ ধরনের কোন কারণে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা সম্পূর্ণ অবৈধ। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, { الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ} . "শয়তান তোমাদের অভাবের ওয়াদা দেয়।" [সূরা আল-বাক্বারা]

৪. ইসলামের শত্রুরা মুসলিমদের সংখ্যা কমানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অথচ, তারা নিজেরা তাদের সংখ্যা বাড়ানো এবং তাদের অধিবাসীদের সংখ্যা যাতে সর্বোচ্চ হয়, তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। তাদের সংখ্যা মুসলিমদের সংখ্যা হতে অধিক হয় এবং মুসলিমদের সংখ্যা কমে যায় এ কারণে তারা মুসলিমদের মধ্যে জন সংখ্যা বৃদ্ধিটাকে সমস্যা হিসেবে তুলে ধরে। যেমনটি মিশর এবং আরও অন্যান্য মুসলিম দেশে বিষয়টি স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত। তারা এটিকে পরিবার পরিকল্পনা করে নামকরণ করে থাকে, বাস্তবে তা পরিকল্পনা নয় বরং মুসলিম নিধন বলা যেতে পারে। তারা আমাদের দেশে জন্ম নিয়ন্ত্রণের টেবলেটগুলো বিনা মূল্যে বিতরণ করে অথচ আমাদের দেশের অভাবী ও গরীবদের জন্য খাদ্য বিতরণ করে না। অভাবীদের অভাব দূরীকরণের কোন চেষ্টা না করে মুসলিমদের সংখ্যা কমানোর চেষ্টা করে। প্রশ্ন হল, মুসলিমরা কি এ ধরনের শরীয়ত বিরোধী কাজের পরিণাম সম্পর্কে একবারও ভেবে দেখছে?

সালাতের ফজিলত এবং যারা সালাত ছেড়ে দেয় তাদের শাস্তি:

১. মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُوْلَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ﴾

"আর যারা নিজেদের সালাতের হিফাজত করে, তারাই জান্নাতসমূহে সম্মানিত হবে।" [সূরা আল-মা'আরিজ: ৩৪-৩৫]

২. মহান আল্লাহ আরও বলেন,

﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾

অর্থ, "তোমার নিকট কিতাবের যে ওহী প্রেরণ করা হয়েছে, তা হতে তিলাওয়াত কর, সালাত কায়েম কর, নিশ্চয় সালাত অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হতে বিরত রাখে। আর আল্লাহর জিকিরই সবচেয়ে বড়। আর আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর।" [সূরা আল-আনকাবুত: ৪৫]

৩. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾

অর্থ, "অতএব সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য দুর্ভোগ, যারা নিজদের সালাতে অমনোযোগী। অর্থাৎ, তারা সালাত আদায় হতে গাফেল, সালাতকে সময়মত আদায় করে না।" [সূরা আল-মা'ঊন : ১-২]

৫. মহান আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾

অর্থ, "অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে, যারা তাদের নিজেদের সালাতে বিনয়াবনত।" [সূরা আল-মুমিনুন: ১-২]

৬. মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ .

অর্থ, "তাদের পরে আসল, এক অসৎ বংশধর যারা সালাত বিনষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।" [সূরা মারইয়াম]

৭. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদের প্রশ্ন করে বললেন,

« أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ، هل يبقى من درنه شئ ؟ قالوا لا يبقى من درنه شئ ، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا» .

অর্থ, "তোমাদের বাড়ির সামনে একটি নদী আছে, তাতে যদি তোমাদের কেউ দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কি কোন ময়লা থাকতে পারে?" সাহাবীরা উত্তরে বললেন, না। তখন রাসূল সা. বললেন, "এ হল পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মাধ্যমে বান্দার গুনাহ সমূহ মুছে দেন।" [বুখারী, মুসলিম]

৮. রাসূল সা. আরও বলেন,

« العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر» .

আমাদের মাঝে আর অমুসলিমদের মাঝে চুক্তি হল, সালাত। যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দিল, সে কুফরী করল। [সহীহ, মুসনাদ আহমদ]

৯. রাসূল সা. আরও বলেন,

« بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» .

একজন মানুষ ও শিরক-কুফরের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারিত হয়, সালাত ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমে। [মুসলিম]

শিশুদের ওযু ও সালাতের শিক্ষা দেয়া

ওযুর নিয়ম হল, প্রথমে বিসমিল্লাহ বলবে।

১. দুই হাতের কব্জি তিনবার ধোয়া, তারপর তিনবার করে নাকে পানি দেয়া ও তিনবার কুলি করা।

২. সমস্ত চেহারা তিনবার ধোয়া।

৩. প্রথমে ডান হাত তারপর বাম হাতের কনুই সহ তিনবার ধোয়া।

৪. সমস্ত মাথা কানসহ মাসেহ একবার করা।

৫. দুই পায়ের টাখনু সহ তিনবার ধোয়া।

আর যদি কোন ব্যক্তি ওযু করতে সক্ষম না হয়, তাকে অবশ্যই তায়াম্মুম করতে হবে। তায়াম্মুমের পদ্ধতি হল, প্রথমে পবিত্রতার নিয়ত করবে, তারপর তুমি তোমার চেহারাকে পাক মাটি দ্বারা মাসেহ করবে, এবং দুই হাতের কব্জীদ্বয় মাটি দ্বার মাসেহ করবে।

ওযু করতে অক্ষম হওয়ার কারণ: হয়তো পানি ব্যবহার দ্বারা ক্ষতি হতে পারে বা পানি না পাওয়া যাওয়া হতে পারে, অথবা সফরে তার সাথে পানি একবারেই কম; যদি ঐ পানি দিয়ে ওযু করে তবে খাওয়ারের পানি থাকবে না। এসব কারণে তার জন্য তায়াম্মম করা বৈধ ও শরিয়ত সম্মত।

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সময় মত আদায় করতে হয়। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কীভাবে আদায় করতে হয়, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেয়া হল, যাতে শিশুরা তাদের জীবনের শুরুতেই সালাত আদায়ের নিয়ম সম্পর্কে অবগত হতে পারে।

ফজরের সালাত যেভাবে আদায় করবে

ফজরের সালাত দুই রাকাত; নিয়ত করা ফরয, তবে নিয়তের স্থান হল, অন্তর মুখে কোন নিয়ত পড়া বা উচ্চারণ করার কোন প্রয়োজন নাই।

১. সালাত আদায়ের সময় প্রথমে কেবলামুখী হয়ে দাড়াতে হবে। তারপর দু হাত কান পর্যন্ত উঠাবে এবং আল্লাহু আকবর বলে হাত বাধবে।

২. হাত বাধার নিয়ম হল, ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে বক্ষের উপর ছেড়ে দেবে। তারপর সানা পড়বে।

« سبحانك اللّٰهُمَّ وبحمدك ، وتبارك اسمـك وتعالى جدك ، ولا اله غيرك»

অর্থ, "হে আল্লাহ আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তোমার প্রশংসা করছি। তোমার নাম কত-না বরকতময়! আর তোমার মর্যাদা কতই না ঊর্ধ্বে! তুমি ছাড়া কোন হক ইলাহ নাই।" এ দোয়াটি ছাড়াও হাদিসে বর্ণিত অন্য যে কোন দুয়া এ দোয়ার পরিবর্তে পড়তে পারবে।

প্রথম রাকাত যেভাবে আদায় করবে -

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم [আ'উযু বিল্লাহি মিনাশশাইতানির রাজীম] পড়বে। অর্থ, "হে আল্লাহ আমি বিতাড়িত শয়তান হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" তারপর بسم الله الرحمن الرحيم [বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম] অর্থ, "আমি পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।" নিম্ন আওয়াজে পড়বে। তারপর সূরা ফাতেহা পড়বে।

﴿الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ * مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ * غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾.

অর্থ: "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব। দয়াময়, পরম দয়ালু বিচার দিবসের মালিক। আপনারই আমরা ইবাদত করি। এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাই। আমাদেরকে সরল পথ দেখান। তাদের পথ যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন। যাদের উপর আপনার ক্রোধ আপতিত হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্ট ও নয়।"

তারপর আবার বিসমিল্লাহ পড়ে, যে কোন একটি সূরা পড়বে। যেমন-

﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ * اللهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

"বল, তিনিই আল্লাহ এক অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। আর তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি। আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই।"

১. সূরা শেষে তুমি দুই হাত উঠাবে এবং তাকবীর (আল্লাহু আকবর) বলে রুকু করবে, রুকুতে তোমার দুই হাতকে তোমার দুই টাখনুর উপর রাখবে এবং রুকুতে তিনবার سبحان ربي العظيم বলবে।

২. তারপর দুই হাত ও মাথা উঠিয়ে বলবে— سمع الله لمن حمده ، اللّهُمَّ ربنا لك الحمد অর্থ, "আল্লাহ শোনেন যে তার প্রশংসা করে। হে আল্লাহ! যাবতীয় প্রশংসা তোমারই।"

৩. তারপর তাকবীর (আল্লাহু আকবর) বলে সেজদা করবে, দুই হাত, হাঁটু, কপাল, নাক, দু পায়ের অঙ্গুলি কেবলা মুখ করে মাটিতে রাখবে। আর সেজদায় গিয়ে سبحان ربي الأعلى। "সুবহানা রাব্বিয়াল আলা" তিনবার বলবে।

৪. তারপর সেজদা থেকে মাথা উঠাবে এবং তাকবীর (আল্লাহু আকবর) বলবে। সেজদা হতে উঠে দুই হাত হাঁটুর উপর রেখে বসবে। তারপর বসা অবস্থায় বলবে, رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর, তুমি আমাকে হেদায়েত দাও, মাপ কর এবং রিজিক দাও।"

৫. তারপর তাকবীর বলে জমিনে দ্বিতীয় সেজদা করবে। এবং সেজদায় سبحان ربي الأعلى তিনবার বলবে। এভাবে প্রথম রাকাত সম্পন্ন করবে।

দ্বিতীয় রাকাত যেভাবে আদায় করতে হবে:

১. তারপর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবে এবং "আ'উযু বিল্লাহ", "বিসমিল্লাহ", "সূরা ফাতেহা" সাথে অন্য একটি সূরা বা কুরআনের যে কোন স্থান থেকে কিছু অংশ তিলাওয়াত করবে।

২. তারপর পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী রুকু-সেজদা করার পর, দ্বিতীয় সেজদা শেষে বসবে। ডান হাতের আঙ্গুলগুলোকে গুছিয়ে রেখে, শাহাদত আঙ্গুলটি উঁচা করে রাখবে এবং আত্তাহিয়াতু পড়বে।

« التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ * اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ »

অর্থ: "যাবতীয় সম্মান আল্লাহর জন্য, আর যাবতীয় সালাত ও সমূদয় পবিত্র প্রসংসা সবই তাঁর জন্য। হে নবী আপনার উপর সালাম বা শান্তি বর্ষিত হোক, অনুরূপভাবে আল্লাহর রহমত ও বরকত। আর সালাম বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং আল্লাহর সকল নেক বান্দাদের উপর, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই, আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।"

হে আল্লাহ আপনি মুহাম্মাদের উপর সালাত পেশ করুন এং তাঁর পরিবারভুক্তদের উপরও, যেমনিভাবে সালাত পেশ করেছেন ইবরাহীমের উপর এবং তার পরিবারের উপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও অতিশয় সম্মানিত। হে আল্লাহ আপনি বরকত প্রদান করুন মুহাম্মাদের উপর এবং মুহাম্মাদের পারিবারভুক্তদের উপরও। যেমনি আপনি বরকত প্রদান করেছেন ইবরাহীমের উপর এবং ইবরাহীমের পরিবারের উপর। নিশ্চয় আপনি অতিশয় প্রশংসিত ও খুবই মর্যাদাবান। [বুখারী]

৩. তারপর দুয়ায়ে মাসূরা পড়বে— যেমন,

اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسح الدجال .

অর্থ, "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের শাস্তি ও কবরের আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আরও আশ্রয় প্রার্থনা করছি, হায়াত ও মওতের ফিতনা হতে এবং মাসীহ-দাজ্জালের ফিতনা হতে।"

৪. ডনে বামে সালাম ফিরাবে। আর উভয় দিকে সালাম ফিরানোর সময় বলবে,

« السلام عليكم ورحمة الله » .

অর্থ, "তোমাদের উপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।"

সালাতের রাকাতের সংখ্যার চার্ট:

সালাত	পূর্বের সুন্নাত	ফরয	পরের সুন্নাত
ফজর	২	২	০
যোহর	২ এবং ২	৪	২
আসর	২ এবং ২	৪	০
মাগরিব	২	৩	২

এশা	২	৪	২ এবং ৩ (বিতর)
জুমা	২ (তাহিয়্যাতুল মসজিদ)	২	২ (ঘরে পড়লে) *অথবা* ২ এবং ২ (মসজিদে পড়লে)

সালাতের কিছু বিধি-বিধান

১. ফরয সালাতের পূর্বে ও পরে কিছু সুন্নাত সালাত আছে সেগুলো পাবন্দির সাথে আদায় করতে হবে।

২. সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় তোমার দৃষ্টি থাকবে সেজদার স্থানের দিকে। এদিক সেদিক তাকাবে না। অনেকে আছে সালাতে এদিক সেদিক তাকিয়ে থাকে, যা সালাতের মধ্যে একাগ্রতার পরিপন্থী।

৩. আর যখন তুমি জামাতে সালাত আদায় করবে, তখন ইমাম যদি কিরাত নিম্ন স্বরে পড়ে, তখন তুমিও তোমার সালাতে কিরাত পড়বে। আর যখন কিরাত উচ্চস্বরে পড়ে, তখন ওয়াকফের ফাকে ফাকে সূরা ফাতেহা পড়ে নিবে।

৪. জুমার সালাতের ফরয হল, দুই রাকাত। জুমার সালাত কেবল শুধু মসজিদে গিয়ে জুমার খুতবার পরে ইমামের সাথে দুই রাকাত সালাত আদায় করে নিবে।

৫. মাগরিবের সালাত তিন রাকাত। ফজরের সালাতের মত দুই রাকাত সালাত আদায় করবে। তারপর যখন দ্বিতীয় রাকাত শেষে আত্তাহিয়্যাতু পড়া শেষ হবে, সালাম ফিরাবে না, তৃতীয় রাকাতের জন্য দুহাত কাঁদ পর্যন্ত উঁচা করে তাকবীর-আল্লাহু আকবর- বলে উঠে দাঁড়াবে। তারপর সূরা ফাতেহা পড়ে, উল্লেখিত নিয়ম অনুযায়ী সালাত সম্পন্ন করবে। তারপর ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে বলবে,

« السلام عليكم ورحمة الله».

অর্থ, তোমাদের উপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

৬. যোহর, আছর ও এশার সালাত চার রাকাত। ফজরের সালাত যেভাবে আদায় করতে হয়, সেভাবে প্রথম দুই রাকাত সালাত আদায় সম্পন্ন করে বৈঠক শেষে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে সালাম না ফিরিয়ে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবে। তৃতীয় রাকাত শেষে চতুর্থ রাকাত পড়বে এবং পরবর্তী দুই রাকাতে সূরা ফাতেহা পড়বে। তারপর সালাতকে সম্পন্ন করার পর ডামে বামে সালাম ফিরাবে।

৭. ভিতিরের সালাত তিন রাকাত। প্রথমে দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরাবে। তারপর এক রাকাত পড়বে এবং সালাম ফিরাবে। উত্তম হল, রুকুর আগে বা পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত দুয়াসমূহ দ্বারা দোয়া করবে। রাসূল হতে বর্ণিত দোয়া যেমন-

اللَّهُمَّ اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، إنك تقضي ولا يقضى عليك ، إنه لا يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت.

অর্থ, হে আল্লাহ! তুমি যাদের হেদায়েত দিয়েছ এবং যাদের তুমি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছ, আমাকে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত কর। তুমি আমাকে যা দান করছ, তাতে তুমি বরকত দাও। তুমি যে সব খারাপ কাজের ফায়সালা করেছ, তা থেকে তুমি আমাকে বাচাও। নিশ্চয় তুমিই ফায়সালা দিয়ে থাক, তোমার বিরুদ্ধে কেউ ফায়সালা দেয় না। তুমি যাকে সম্মান দাও তাকে আর কেউ অপমান করতে পারে না। আর তুমি যাকে অপমান কর, তাকে কেউ ইজ্জত দিতে পারে না। হে প্রভু! তুমি বরকতময় ও মহান।

৮. যখন ইমামের সাথে সালাত আদায় করবে, তখন তুমিও তার সাথে সালাতে দাঁড়াবে এবং তাকবীর -আল্লাহু আকবর- বলবে। ইমামকে যে অবস্থায় পাবে, সে অবস্থায় ইমামের সাথে শরীক হয়ে যাবে। যদি ইমাম রুকু-রত হয়ে থাকে, তখন তুমি রুকুতে শরীক হয়ে, ইমামের অনুকরণ করবে, যদি তুমি ইমামের সাথে পুরোপুরি রুকু পাও, তাহলে তুমি সে রাকাত পেলে। আর যদি রুকু না পাও তাহলে, সে রাকাত পেয়েছ, বলে হিসাব করা যাবে না। ঐ রাকাত তোমাকে পরবর্তীতে আবার আদায় করতে হবে।

৯. আর যখন তোমার রাকাত ছুটে যাবে, তখন তা ইমামের সালাম ফিরানোর পর আদায় করবে। ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে না। বাকী সালাত আদায়ের জন্য তুমি একা দাড়িয়ে যাবে।

১০. মনে রাখবে সালাতে তাড়াহুড়া করবে না। কারণ, তা সালাত বাতিল করে দেয়। হাদিসে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোককে সালাতে তাড়াহুড়া করতে দেখে বলল, [إرجع فصل فإنك لم تصل] তুমি ফেরৎ যাও এবং পুনরায় সালাত আদায় কর। তখন লোকটি ফেরত গিয়ে আবার সালাত আদায় করল, রাসূল তাকে আবার বলল, তুমি ফেরত যাও, পুনরায় সালাত আদায় কর, এভাবে তিনবার রাসূল লোকটিকে ফেরত পাঠাল। লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তৃতীয়বারে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সালাতের নিয়ম শিখিয়ে দিন, তখন সে বলল,

« اركع حتى تطمئن راكعاً ، ثم ارفع حتى تستوي قائماً ، ثم اسجد حتى تضمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تضمئن جالساً » .

অর্থ, তুমি রুকু কর, এমনভাবে যাতে রুকুতে তুমি স্বস্তি লাভ কর। তারপর রুকু হতে সোজা হয়ে দাড়াও, তারপর সেজদা কর, যাতে সেজদায় তুমি স্বস্তি লাভ কর। তারপর তুমি মাথা উঠাও যাতে বসা অবস্থায় তুমি স্বস্তি পাও।

১১. যখন সালাতের ওয়াজিবসমূহ হতে কোন ওয়াজিব ছুটে যাবে, যেমন- তোমরা প্রথম বৈঠক ছুটে গেল, অথবা তুমি কত রাকাত পড়ছ, তা ভুলে গেছ, তখন তুমি নিশ্চিত সংখ্যা অনুযায়ী সালাত আদায় করে নিবে এবং সালাতের শেষাংশে দুই সেজদা করবে এবং সালাম ফিরাবে। এ সেজদাকে সেজদায়ে সাহু বলে।

১২. সালাতে অধিক নড়াচড়া করবে না। কারণ, অধিক নড়া-চড়া করা সালাতে একাগ্রতা ও খুশুর পরিপন্থী। অনেক সময় বিনা প্রয়োজনে অধিক নড়া-চড়া সালাত নষ্টেরও কারণ হয়।

১৩. এশার সালাতের সময় অর্ধ রাত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। এ সময়ের মধ্যে সালাত আদায় করে নিতে হবে, সুতরাং প্রয়োজন ছাড়া এশার সালাতকে দেরি করা ঠিক হবে না। আর বিতর সালাতের সময় সুবহে সাদিক উদয় হওয়া পর্যন্ত। বিতর সালাত হল রাতের সর্বশেষ সালাত।

সালাতের হাদিসসমূহ:

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

صلوا كما رأيتموني أصلي

অর্থ, তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখ, সেভাবে সালাত আদায় কর।

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس « وتسمى تحية المسجد» .

তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে যেন বসার পূর্বে দুই রাকাত সালাত আদায় করে নেয়। [এ দু রাকাত সালাতকে তাহিয়্যাতুল মসজিদ বলা হয়]

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلوا إليها.

তোমরা কবরকে আসন বানাবে না এবং কবরের দিকে মুখ করে সেজদা করবে না।

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

إذا أقيمت الصلاة ، فلا صلاة إلا المكتوبة

যখন সালাতের ইকামত দেয়া হয়, তখন তোমরা ফরয সালাত ছাড়া আর কোন সালাত আদায় করবে না।

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أقيموا صفوفكم وتراصوا ، قال أنس وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه ، وقدمه بقدمه .

অর্থাৎ তোমরা সালাতের কাতার ঠিক কর এবং একে অপরের সাথে মিলে দাড়াও। আনাস রা. বলেন, আমরা সালাতে একে অপরের কাঁধের সাথে ও পায়ের সাথে মিলিয়ে সালাতে দাঁড়াতাম।

৬. রাসূল বলেন,

إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، وأتوها وأنتم تمشون ، وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا .

অর্থ, যখন সালাতের ইকামত দেয়া হয়, তখন তোমরা দৌড়ে দৌড়ে সালাতে উপস্থিত হবে না। তোমরা স্বাভাবিকভাবে হেঁটে সালাতে উপস্থিত হবে। তোমরা নমনীয়তা

প্রদর্শন কর। ইমামের সাথে যতটুকু পাবে আদায় করবে, আর যতটুকু ছুটে যাবে, তা পরে তোমরা একা একা সম্পন্ন করবে।

৭. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إذا سجدت فضع كفيك، وارفع مرفقيك.

অর্থ, যখন তুমি সেজদা করবে তখন তুমি তোমার উভয় হাত জমিনে রাখবে, আর তোমার দুই বাহুকে উঠিয়ে রাখবে; মাটি হলে আলাদা করে রাখবে।

৮. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع والسجود.

"আমি তোমাদের ইমাম, সুতরাং রুকু সেজদায় তোমরা আমার থেকে আগে বাড়বে না।" মুক্তাদি কখনোই ইমামের আগে কিছু করবে না। যদি তা করে তাহলে তার সালাত আদায় হবে না।

৯. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله.

অর্থ, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব করা হবে, যখন সালাত ঠিক থাকে, তখন তার যাবতীয় সব আমলই ঠিক থাকে। আর যখন তার সালাতের অবস্থা খারাপ হয়, তখন তার সমস্ত আমলই নষ্ট হয়ে থাকে।

জুমার সালাত ও জামাত ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে

জুমার সালাত আদায় করা এবং জামাতে সালাত আদায় করা ওয়াজিব। নিম্নে এর উপর কুরআন ও হাদিসের একাধিক দলীল পেশ করা হল।

১. মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

অর্থ, হে মুমিনগণ, যখন জুমুআর দিনে সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও। আর বেচা-কেনা করা ছেড়ে দাও। এটা তোমাদের জন্য অতি উত্তম। যদি তোমরা জানতে পারতে।

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة ، فأحرق عليهم» .

অর্থ, আমার ইচ্ছা হয়, আমি একজনকে সালাতের নির্দেশ দেই, সে সালাত কায়েম করে যাবে, আর আমি মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে যারা সালাতের জামাতে উপস্থিত হয়নি, তাদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেই।

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« من سمع النداء ، فلم يأته ، فلا صلاة له إلا من عذر » « الخوف أو المرض» .

যে ব্যক্তি কোন প্রকার অপারগতা [ভয়ভীতি ও অসুস্থতা] ছাড়া আযান শোনে সালাতে উপস্থিত হয় না, তার সালাত আদায় হয় না।

৪. হাদিসে বর্ণিত,

أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعمى ، فقال يا رسول الله ، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له ، فرخص له ، فلما ولّى دعاه فقال هل تسمع النداء «بالصلاة» قال نعم ، قال فأجب» .

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট একজন অন্ধ লোক এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন অন্ধ মানুষ আমার এমন কোন লোক নাই যে, আমাকে মসজিদে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। সুতরাং আপনি আমাকে জামাতে অনুপস্থিত ও ঘরে সালাত আদায় করার অনুমতি দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তাকে অনুমতি দেন। তারপর লোকটি চলে যেতে আরম্ভ করলে তাকে ডেকে পাঠিয়ে

বলেন, তুমি কি সালাতের আযান শোনতে পাও? বলল, হ্যাঁ। তাহলে তুমি সালাতের জামাতে উপস্থিত হও।

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«من اغتسل ، ثم أتى الجمعة ، فصلى ما قدر له ، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ، ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ، وفضل ثلاثة أيام» .

যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করল, তারপর মসজিদে উপস্থিত হল, এবং তার জন্য যা নির্ধারণ করা হল, সে পরিমাণ সালাত আদায় করে ইমামের খুতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকে এবং ইমামের সাথে দুই রাকাত ফরয সালাত আদায় করে, আল্লাহ তা'আলা এ জুমা হতে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত মাঝখানের গুনাহ গুলো ক্ষমা করে দেবেন এবং আরও অতিরিক্ত তিনি দিনের অপরাধ ক্ষমা করে দেবে।

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها ، طبع الله على قلبه» .

যে ব্যক্তি অলসতা করে পরপর তিনটি জুমার সালাত আদায় ছেড়ে দিল, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরের উপর মোহর মেরে দেয়।

সুন্নাত তরীকায় কীভাবে জুমার সালাত আদায় করব?

১. জুমার দিন সকাল বেলা গোসল করবে। হাত পায়ের আঙ্গুল কাটবে এবং ওজু করার পর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করব ও সুগন্ধি ব্যবহার করব।

২. আমরা কাঁচা পেয়াজ ও রসূন খাবো না, ধূমপান করব না এবং আমাদের মুখ ধোবো এবং মিসওয়াক বা ব্রাশ দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করব।

৩. মসজিদের প্রবেশের সময় দুই রাকাত সালাত আদায় করব, যদিও খতীব মিম্বারে খুতবার জন্য দাড়িয়ে যায়। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাত সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

« إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب ، فليركع ركعتين وليتجوز فيهما »

অর্থ, তোমাদের কেউ যখন ইমাম সাহেব খুতবা দেয়ার সময় জুমার সালাতে উপস্থিত হয়, তখন সে সংক্ষেপে দু রাকাত সালাত আদায় করে নিবে।

৪. আমরা ইমাম বা খতীবের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনবো, কোন কথা বলব না।

৫. ইমামের সাথে মুক্তাদি হয়ে, জুমার দুই রাকাত ফরয সালাত আদায় করব।

৬. জুমার সালাতের পর চার রাকাত সুন্নত সালাত আদায় করব। অথবা বাসায় গিয়ে দু-রাকাত সালাত আদায় করব। এটি হল, উত্তম।

৭. জুমার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর বেশি বেশি করে দরুদ পড়বে।

৮. জুমার দিন যে মুহূর্তটি মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করলে দোয়া কবুল হয়, তা পাওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাব। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه» .

অর্থ, নিশ্চয় জুমার দিন এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, ঐ মুহূর্তটি মধ্যে কোন মুসলিম বান্দা মহান আল্লাহর নিকট কোন কল্যাণ কামনা করে, মহান আল্লাহ তা‘আলা সে কল্যাণ তাকে অবশ্যই দান করবে।

গান-বাজনার বিধান:-

১. মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾.

অধিকাংশ তাফসীরকারকদের মতে لَهْوَ الْحَدِيثِ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, গান। বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে ইবনে মাসউদ রা. বলেন, এখানে উদ্দেশ্য হল, গান। হাসান বসরী রহ. বলেন, আয়াতটি গান-বাজনা ও বাদ্য-যন্ত্র বিষয়ে নাযিল হয়েছে।

২. মহান আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে খেতাব করে বলেন,

﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ﴾

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر «الزنا» والحرير، والخمر والمعازف» – الموسيقى – .

অর্থ, আমার উম্মতের মধ্যে এমন কতক সম্প্রদায়ের আগমন ঘটবে, যারা ব্যভিচার, রেশমি কাপড় পরিধান, মদ-পান ও গান-বাজনাকে হালাল জানবে।

একই অর্থে অপর একটি হাদিসে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, মুসলিম সম্প্রদায় হতে একটি জামাত এমন হবে, যারা ব্যভিচার করা, রেশমি কাপড় পরিধান, মদ্য-পান ও গান-বাজনাকে হালাল বলে বিশ্বাস করবে, অথচ তা হারাম।

হাদীসে বর্ণিত "মায়াযেফ" বলা হয়, যে সব বাদ্য যন্ত্রে সূর রয়েছে। যেমন, বাঁশি, তবলা, ঢোল ইত্যাদি। এমনকি ঘণ্টিও তার অন্তর্ভুক্ত। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, [الجرس مزامير الشيطان] . অর্থ, ঘণ্টা হল, শয়তানের বাদ্য-যন্ত্র। হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঘণ্টার আওয়াজও ইসলাম পছন্দ করে নি। জাহিলিয়্যাতের যুগে মুশরিকরা তাদের চতুষ্পদ জন্তুর গলায় এ ধরনের ঘণ্টা ঝুলিয়ে দিত। এছাড়া খ্রিষ্টানরা যে নাকুস ব্যবহার করে, তার সাথে এর সামঞ্জস্য রয়েছে। সুতরাং ঘণ্টা ব্যবহার হতে বিরত থাকতে হবে। যদি একেবারেই প্রয়োজন হয়, তবে তার পরিবর্তে কলিং বেল ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪. ইমাম শাফেয়ী রহ. থেকে কিতাবুল কাযাতে বর্ণিত হয়েছে যে, গান হচ্ছে অনর্থক কাজ ও অপছন্দনীয় কাজ। যে ব্যক্তি গান-বাজনায় ব্যস্ত থাকে সে অবশ্যই নির্বোধ, তার সাক্ষ্য কবুল করা হবে না, প্রত্যাখ্যান করা হবে।

বর্তমান সময়ে গান বাজনা:

১. বর্তমানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বিবাহ-শাদি, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদিতে যে সব গান-বাজনা পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই অশ্লীল ও অশালীন। এ সব গানে সাধারণত প্রেম, ভালোবাসা, নারীদের আলিঙ্গন, তাদের চেহারার বর্ণনা ইত্যাদি দ্বারা ভরপুর। এগুলো সবই যৌন উত্তেজক, যেগুলি যুবকদের যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি করে, তাদের জেনা-ব্যভিচারের দিকে ধাবিত করে এবং তাদের নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস করে।

২. যখন গান ও বাদ্য এক সাথে চলতে থাকে, তখন তার পরিণতি হয়, খুবই ভয়াবহ। যুব সমাজের চরিত্র অশ্লীল গান-বাজনা ও ফিল্ম দেখা ইত্যাদির কারণে চরম অবনতির দিকে যায়। অধিকাংশ যুবকরা এ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মারাত্মক ধ্বংসের মুখে নিপতিত হয় এবং তারা তখন মহান আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভুলে, দুনিয়ার ভোগ বিলাস ও আনন্দ পূর্তিতে মাতোয়ারা হয়ে পড়ে। এমনকি ১৯৬৭ যখন ইয়াহুদিদের সাথে যুদ্ধ চলছিল, তখন ঘোষণা হল যে, তোমরা সামনের দিকে অগ্রসর হও, কারণ, তোমাদের সাথে অমুক অমুক গায়িকা আছে যারা তোমাদের গানের মাধ্যমে উৎসাহ দিয়ে যাবে। এ ঘোষণার পর ইয়াহুদীদের সাথে মুসলিমদের শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হল। কারণ, তাদের উচিত ছিল এ কথা বলা, তোমরা সামনের দিকে অগ্রসর হও! তোমাদের সাথে মহান আল্লাহর সাহায্য বহাল আছে। তা না করে তারা নারীদের গান-বাজনার প্রতি আহ্বান করল, যা আল্লাহ তা'আলার পছন্দ হল না।

৩. মনে রাখতে হবে, অনেক সময় এমন হয়, দ্বীনি বা ইসলামের নামে যে সব গান গাওয়া হয় বা বাজারে পাওয়া যায়, সে গুলোও অন্যায় অশ্লীল হতে খালি হয় না। যেমন, বুসীরীর কাব্যগুলো তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এ ছাড়াও দেখুন কোন এক গায়ক বলেছিল

وقبل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلم .

এখানের শেষের অংশটি আল্লাহ ও রাসূলের উপর মিথ্যারোপ বৈ কিছুই না, যা বাস্তবতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

গান বাজনা হতে বাঁচার উপায়:

১. রেডিও টেলিভিশন ইত্যাদিতে গান-বাজনা শোনা ও দেখা হতে দূরে থাকতে হবে। বিশেষ করে যৌন উত্তেজক গান, ও বাজনাসহ গান শোনা হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে।

২. মহান আল্লাহর জিকির ও কুরআনের তিলাওয়াত গান বাজনা থেকে বাচার সর্বোত্তম পন্থা। বিশেষ করে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة» .

অর্থ, যে ঘরে সূরা বাকারাহ তিলাওয়াত করা হয়, সে ঘর থেকে শয়তান পলায়ন করে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ .

হে মানব সকল! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভূর পক্ষ হতে উপদেশ এসেছে এবং এসেছে তোমাদের অন্তরে যে সব ব্যাধি রয়েছে, তার জন্য শিফা। আর মুমিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমত।

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সীরfত, তার আখলাক সম্পর্কীয় কিতাবাদি ও সাহাবীদের জীবনী বেশি বেশি করে অধ্যয়ন করা।

যে সব গান গাওয়া বৈধ:

১. ঈদের দিন গান গাওয়া বৈধ। যেমন, আয়েশা রা. এর হাদিসে বর্ণিত, তিনি বলেন,

« دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ، وعندها جاريتان تضربان بدفين « وفي رواية عندي جاريتان تغنيان» فانتهرهما أبو بكر ، فقال صلى الله عليه وسلم : دعهن فإن لكل قوم عيداً ، وإن عيدنا هذا اليوم» .

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট প্রবেশ করে, তখন তার নিকট দুইজন বাঁদি ছিল, তারা উভয়ে দুটি ঢোল বাজাচ্ছিল, অপর বর্ণনায় আছে তারা দুইজন গান গাচ্ছিল, তাদের দেখে আবু বকর রা. ধমক দিলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রা. কে বলল, তাদের আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও, কারণ, প্রতিটি সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য ঈদ আছে, আর আমাদের ঈদ হল আজকের দিন।

২ . বিবাহের অনুষ্ঠানে বিবাহের প্রচার প্রসারের জন্য ঢোল তবলা বাজিয়ে গান করা বৈধ। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«فصل ما بين الحلال والحرام ، ضرب الدف ، والصوت في النكاح»

অর্থ, হারাম ও হালালের মধ্যে প্রার্থক হল, ঢোল বাজানো ও বিবাহের প্রচার করা।

৩. কোন কাজ সম্পাদন করার সময় ইসলামী গান গাওয়া। কারণ, তখন কাজের মধ্যে আনন্দ পাওয়া যায় এবং চাঞ্চল্যটা ফিরে আসে। বিশেষ করে যখন গানে দোয়া বা

আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি থাকে। এ ধরনের গানের জন্য রাসূল নিজেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন। তিনি খন্দকের যুদ্ধে যখন পরিখা খনন করছিলেন, তখন তিনি তার সঙ্গীদের কর্ম চাঞ্চল্যটা ফিরিয়ে আনতে এ ধরনের কাব্যগুলো পড়েন। যেমন ইবনে মাজাতে বর্ণিত:

اللَّهُمَّ لا عيش إلا عيش الآخرة ** فاغفر للأنصار والمهاجرة

অর্থ: হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই জীবন। আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দিন।

এ কথার উত্তরে আনসার ও মুহাজিররা বলল:

نحن الذين بايعوا محمداً ** على الجهاد ما بقينا أبدا

আমরা তারাই যারা মুহাম্মদের হাতে জিহাদের অঙ্গীকার করি। যতদিন পর্যন্ত আমরা জমিনে বেচে থাকি।

والله لولا الله ما اهتدينا ** ولا تصدقنا ولا صلينا

মহান আল্লাহ দয়া আমাদের উপর না থাকলে, আমরা হেদায়েত পেতাম না এবং আমরা আল্লাহর রাহে সদকা করতাম না এবং সালাত আদায় করতাম না।

فأنزلن سكينة علينا ** وثبت الأقدام إن لاقينا

আপনি আমাদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন। আমরা যখন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করব, তখন আমাদের তুমি অটল ও অবিচল রাখুন।

والمشركون قد بغوا علينا ** إذا أرادوا فتنة أبينا

মুশরিকরা আমাদের উপর নির্যাতন করছে। তারা যখন আমাদের শিরক করতে বলে আমরা তা অস্বীকার করি।

তারা أبينا ... أبينا .. [শিরিককে অস্বীকার করি, অস্বীকার করি] বলে চিৎকার করত।

৪. যে সব গানে আল্লাহর প্রশংসা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মোহাব্বত ও রাসূলের গুণাগুণ থাকে, ঐ ধরনের গান গাওয়া নি:শন্দেহে বৈধ। অনুরূপভাবে যে সব গানে জিহাদের উপর উদ্বুদ্ধ করা হয়, ঈমানের উপর অবিচল ও অটুট থাকার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয় এবং নৈতিক চরিত্র সংশোধন বিষয়ে উৎসাহ দেয়া হয়, সে সব গান গাওয়াতে কোন প্রকার ক্ষতি নাই। এ ছাড়াও যে সব গানে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ভালোবাসা জাগ্রত, মুসলিমদের মাঝে সু-সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করে, ইসলামের সৌন্দর্য তূলে ধরা হয়, এ ধরনের গান বৈধ বা প্রশংসিত হওয়াতে কোন

সন্দেহ নাই। কারণ, এ ধরনের গানের মাধ্যমে সমাজ উপকৃত হয়, মানুষের নৈতিক চরিত্র ও মন-মানসিকতার উন্নতি হয়।

৫. বাদ্য যন্ত্রের মধ্য হতে ঈদের দিন ও বিবাহ অনুষ্ঠানে ঢোল বাজানোকে বৈধ করা হয়েছে। জিকিরের মজলিশে ঢোল বাজানো সম্পূর্ণ হারাম। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তারপর তার সাহাবীরা কখনোই জিকিরের মজলিসে ঢোল-তবলা বাজায়নি। কিন্তু ছুফিরা ঢোল বাজানোকে হালাল মনে করে এবং জিকিরের মজলিশে ঢোল বাজানোকে সুন্নাত বলে, অথচ তা বিদআত। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة».

অর্থ: তোমরা কুসংস্কার হতে বেচে থাক, কারণ, সব কুসংস্কারই হল, বিদআত। আর প্রতিটি বিদআত হল, গোমরাহি।

ছবি ও মূর্তির বিধান:

ইসলাম মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহর সাথে অন্য মাখলুক যেমন, আল্লাহর অলি, নেককার বান্দা, মূর্তি, কবর, মাজার, ছবি ইত্যাদির পূজা করা বা কোন কিছুকে তার সাথে শরীক করা হতে নিষেধ করে। মহান আল্লাহ তা'আলা যেদিন থেকে মানুষের হেদায়েতের জন্য নবী রাসূলদের দুনিয়াতে পাঠান, সেদিন থেকেই তারা মানুষদের তাওহীদের দাওয়াত দেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ﴾

অর্থ, আর আমি প্রতিটি সম্প্রদায়ের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করি, তিনি দাওয়াত দেন যে, তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে দূরে থাক।

তাগুত: আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব কিছুর ইবাদত করা হয়, তাদের তাগুত বলা হয়। মুশরিকরা যে সব মূর্তির পূজা করত, সূরা নূহতে মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের আলোচনা করেন। যেমন, বুখারী শরীফে বর্ণিত, ইবনে আব্বাস রা. আল্লাহর তা'আলার বাণী-

﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا﴾

আর তারা বলে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদের বর্জন করো না; বর্জন করো না ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক, ও নাসরকে। বস্তুত তারা অনেককে পতভ্রষ্ট করেছে, আর (হে আল্লাহ) আপনি যালিমদেরকে ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই বাড়াবেন না।

এর ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতে উল্লেখিত নাম গুলো হল, নূহ আ. এর সম্প্রদায়ের নেককার লোক ও মহৎ ব্যক্তিবর্গ। এরা মারা গেলে শয়তান তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট ওহী পাঠান যে, তোমরা তাদের বসার স্থানে তাদের আকৃতিতে মূর্তি তৈরি কর এবং তাদের নামেই মূর্তিগুলোর নাম করণ কর। তখন তারা তাই করল। তখন পর্যন্ত তারা তাদের কোন ইবাদত করত না। তারপর যখন এ প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে গেল, পরবর্তী প্রজন্ম এসে তাদের পূর্বসূরিদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে না জেনে মূর্তিগুলোর ইবাদত করতে আরম্ভ করে। এ ঘটনাটি দ্বারা একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, মানবজাতির মধ্যে শিরকের বিস্তার লাভের প্রধান কারণ হল, ছবি বা মূর্তি। কিন্তু বর্তমানে দু:খের বিষয় হল, অনেকেই মনে করে, এ ধরনের ছবি হালাল। কারণ, এখন এ ধরনের লোক পাওয়া যায় না, যারা ছবির ইবাদত করে। তাদের এ দাবি সঠিক নয়। কারণ, ছবি হল, শিরক এর প্রবেশের দরজা।

১. একটি কথা মনে রাখতে হবে, বর্তমানেও ছবি ও মূর্তির পূজা করা হয়ে থাকে। যেমন, ঈসা আ. ও তার মাতা মারিয়াম আ. মারা যাওয়ার পর, মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আকৃতির ইবাদত, এখনো করা হয়। ঈসা আ. এর ছবি সম্বলিত অনেক বড় বড় পোষ্টার বাজারে চড়া মূল্যে বিক্রি করা হয়। এ গুলোকে ইবাদতের লক্ষ্যে ঘরে ঝুলিয়ে রাখা হয়, এ গুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়।
২. বর্তমান যুগেও বড় বড় নেতাদের ছবির প্রতি মানুষের মাথা নত করা হয়। মানুষ যখন তাদের মূর্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তখন তারা তাদের সম্মানে দাড়িয়ে যায়, কোমর বাঁকা করে পিঠ ঝুলিয়ে দেয়। যেমন, আমেরিকাতে জর্জ ওয়াশিংটন, ফ্রান্সে নেপোলিয়ন ও রাশিয়াতে লেনিনের ছবিকে রাস্তার মোড়ে মোড়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। যারা তাদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে তাদের সম্মানে মাথা ঝুঁকায়। বর্তমানে প্রতিকৃতি নির্মাণের এ ধারণাটি আরব জাহান ও মুসলিম দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। তারা কাফেরদের অন্ধ অনুকরণ করে যাচ্ছে, তারা তাদের নেতাদের প্রতিকৃতি রাস্তার মোড়ে মোড়ে স্থাপন করে। এভাবে অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহেও মূর্তির বিস্তার হচ্ছে। যে সব টাকা দিয়ে প্রতিকৃতি তৈরি করা হয়ে থাকে, সে সব দিয়ে মসজিদ মাদ্রাসা, হাসপাতাল, জন-কল্যাণমূলক ট্রাস্ট তৈরি করে তাদের নামে নাম করণ করা যেতে পারে; তাতে কোন সমস্যা নাই। তাতে মানুষের উপকার আরও বেশি হবে। আর তাদের নামে নাম করণ করার মধ্যে কোন ক্ষতি নাই।
৩. কালের বিবর্তনে দেখা যাবে, যারা বর্তমানে প্রতিকৃতি গুলোর সেজদা করছে না, তারাও এক সময় এসে এগুলোর সেজদা করতে আরম্ভ করবে এবং ইবাদত করতে শুরু করবে। যেমনটি ইউরোপ, তুরস্ক ও অন্যান্য দেশে এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আর এ বিষয়ে নূহ আ. এর সম্প্রদায়ের লোকেরাই হল ইতিহাসের সূচনা। কারণ, তারাই প্রথমে তাদের নেতাদের প্রতিকৃতি স্থাপন করে, তারপর তাদের সম্মান ও ইবাদত করে।
৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী ইবনে আবু তালিব রা. কে এ বলে নির্দেশ দেন যে, তুমি কোন মূর্তিকে দেখা মাত্র নিষ্পেষিত করে দেবে এবং কোন উঁচা কবর দেখলে তাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে।

যে সব বস্তুর ছবি বা প্রতিকৃতি বৈধ:

১. সব বস্তুর রুহ নাই, সে সব বস্তুর ছবি তোলা হালাল বা বৈধ। যেমন- গাছ-পালা, চন্দ্র, সূর্য, পাহাড়, পাথর, নদ-নদী, সমুদ্র, পবিত্র স্থান, মসজিদ, মদিনার মসজিদ, বাইতুল্লাহ ইত্যাদির ছবি বৈধ। এর প্রমাণ হল, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর উক্তি: তিনি বলেন, যদি তোমাকে ছবি নির্মাণ করতেই হয়, তবে তুমি গাছ-পালা প্রাকৃতিক দৃশ্য ও যে সব বস্তুর জীবন নাই সে সবের ছবিই অংকন কর।
২. প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহারের জন্য ছবি তোলা বৈধ। যেমন- পাসপোর্ট, ন্যাশনাল আইডি কার্ড, গাড়ির লাইসেন্স ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কাজে ছবি তোলার অনুমতি আছে।
৩. চোর, ডাকাত, অপরাধীদের ধরার জন্য তাদের ছবি টানিয়ে দেয়া বৈধ, যাতে তাদের বিচারের মুখোমুখি করা যেতে পারে।
৪. মেয়েদের জন্য টুকরা কাপড় দিয়ে পুতুল বানিয়ে সেগুলো দ্বারা খেলা-ধুলা করা বৈধ। যখন তারা ছোট থাকে, তখন তারা এ ধরনের খেলা-ধুলা করতে পারে; যাতে তারা যখন মা হয়, তখন শিশুদের কীভাবে লালন-পালন করতে হয়, তা শিখে। আয়েশা রা. এর কথা তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ, তিনি বলেন,

كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে খেলা-ধুলা করতাম। আর শিশুদের জন্য অশ্লীল কোন খেলা-ধুলা ক্রয় করা উচিত নয়; বিশেষ করে উলঙ্গ মেয়েদের ছবি। কারণ, এ সব দেখে তারাও নিজেরা শিখবে এবং তাদের অনুকরণ করবে। ফলে সমাজকে কলুষিত করবে। এ ছাড়াও এ সব ক্রয় করার মাধ্যমে টাকাগুলো দ্বারা ইয়াহুদী, নাছারা ও ইসলামের শত্রুদের সহযোগিতা করা হয়; যাতে তারা মুসলিমদের বিপক্ষে শক্তি অর্জন করে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

ধূমপানের বিধান:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে বিড়ি, সিগারেট তামাক ইত্যাদি ছিল না। তবে ইসলামের সাধারণ মূলনীতি হল, মানুষের জন্য ক্ষতিকর, প্রতিবেশীর জন্য কষ্টকর অথবা সম্পদের অপচয় এমন সবকিছুই হারাম। নীচে ধূমপান হারাম হওয়ার উপর বিশেষ কয়েকটি প্রমাণ পেশ করা হল:

১. মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ﴾

আর তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তুকে হালাল করেছেন এবং অপবিত্র বস্তুকে তাদের উপর হারাম করেছেন।

আর বিড়ি-সিগারেট অপবিত্র বস্তুর অন্তর্ভুক্ত ও দুর্গন্ধময় বস্তু।

২. মহান আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

তোমরা তোমাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না।

ধূমপান মানুষের জন্য মারাত্মক ব্যাধির কারণ হয়, যেমন ধূমপানের কারণে ক্যান্সার, রক্তচাপ, যক্ষ্মা, বক্ষ ব্যাধি ইত্যাদি আরও নানান ধরনের ব্যাধি হয়ে থাকে।

৩. মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,{ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ } [তোমরা তোমাদের নিজেদের হত্যা করো না।] ধূমপানের কারণে মানুষের আয়ু কমে আসে এবং অকাল মৃত্যুর কারণ হয়।

৪. মহান আল্লাহ তা'আলা মদের ক্ষতি সম্পর্কে বলেন,

﴿وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾.

আর এ দুটির গুণাহ উপকারের চেয়ে অধিক মারাত্মক।

অনুরূপভাবে ধূমপানের ক্ষতি উপকারের তুলনায় মারাত্মক। বরং ধূমপানে ক্ষতি ছাড়া কোন উপকার নাই।

৫. মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾.

নিশ্চয় অপচয়কারী হল, শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রভূকে অস্বীকারকারী।

ধূমপান হল, অর্থের অপচয়। আর সম্পদের অপচয় করা হল, শয়তানের কাজ।

৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« لا ضرر ولا ضرار»

ইসলামে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বা ক্ষতি করার কোন অবকাশ নাই। আর ধূমপান মানুষের জন্য ক্ষতিকারক, প্রতিবেশীর কষ্টের কারণ এবং সম্পদের অপচয়।

৭. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

وكره الله لكم إضاعة المال মহান আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য সম্পদের অপচয় করাকে অপছন্দ করেছেন।

৮. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« كل أمتي معافى إلا المجاهرين»

আমার উম্মতের সব অপরাধীকে ক্ষমা করা হবে। তবে মুহাজিরকে ক্ষমা করা হবে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে অপরাধ করে এবং কোন অপরাধ করে তা মানুষের সামনে প্রকাশ করে। ধূমপানকারী প্রকাশ্যে ধূমপান করে, অন্যদের ধূমপানের মত অপরাধকে উৎসাহ দেয়।

৯. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره»

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস করে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। প্রতিবেশিকে কষ্ট দেয়া হারাম। আর ধূমপানকারী তার মুখের দুর্গন্ধ দ্বারা তার স্ত্রী, সন্তান ও প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয়। বিশেষ করে ফেরেশতা ও মুসল্লিরা তার মুখের দূর্গগন্ধের কারণে কষ্ট পায়।

দাড়ি বড় করার বিধান:

১. মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ﴾

আর দাড়ি মুণ্ডন আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করার সামিল এবং শয়তানের অনুকরণ বৈ কিছুই না। [সূরা আন-নিসা: ১১৯]

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس» .

তোমরা গোপকে খাট কর, দাড়িকে বড় কর এবং অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা কর। অর্থাৎ দাড়ি যদি তোমাদের ঠোটের উপর বর্ধিত হয়, তখন বর্ধিতাংশ তোমরা কেটে ফেল। আর কাফেরদের বিরোধিতা স্বরূপ তোমরা তোমাদের দাড়িকে লম্বা কর।

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«عشر من الفطرة ، قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك واستنشاق الماء ، وقص الأظافر ....»

দশটি জিনিষ ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। আর তা হল, গোপকে খাট করা দাড়িকে লম্বা করা, মিসওয়াক করা, পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা এবং হাত-পায়ের নখ কাটা....।

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব পুরুষরা নারীদের সাথে সাদৃশ্য রাখে, তাদের অভিশাপ করেন। আর দাড়ি মুণ্ডন নারীদের সাথে সাদৃশ্য রাখারই নামান্তর এবং আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণ।

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« لكني أمرني ربي عز وجل أن أعفي لحيتي وأن أقص شاربي» .

তবে আমার রব আমাকে আদেশ দেন যে, আমি যেন আমার দাড়িকে বড় করি এবং গোপকে খাট করি। মনে রাখতে হবে, দাড়িকে বড় করা আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ, যা পালন করা অবশ্যই কর্তব্য বা ওয়াজিব।

মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করা:

তুমি যদি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ চাও তাহলে নিম্নে বর্ণিত উপদেশগুলো পালন কর।

১. মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তাদের কখনোই কষ্ট দেবে না এবং তাদের ধমক দিয়ে কথা বলবে না। তাদের সাথে সুন্দর ও মনোরম ব্যবহার করবে।

২. তারা যদি কোন অন্যায়ের আদেশ না দেয়, তখন তাদের আদেশের আনুগত্য করবে। আর তারা যদি কোন অন্যায় কাজ করতে বলে, তাহলে তাদের অনুকরণ হতে বিরত থাকবে। কারণ, আল্লাহর নাফরমানিতে কোন মাখলুকের আনুগত্য নাই।

৩. মাতা-পিতার সাথে নম্র ব্যবহার করবে, তাদের সাথে মুখ কালাকালি করবে না এবং তাদের দিকে চোখ রাঙিয়ে তাকাবে না।

৪. মাতা-পিতার সুনাম, মান-মর্যাদা ও তাদের ধন-সম্পত্তির সংরক্ষণ করবে। তাদের অনুমতি ছাড়া তাদের কোন কিছু ধরবে না।

৫. যে কাজ করলে তারা খুশি হয়, তা করা। যেমন, তাদের খেদমত করা, পড়া লেখা করা ও তাদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনে দেয়া।

৬. তোমার যাবতীয় কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করবে। যখন বাধ্য হয়ে তাদের কোন বিরোধিতা কর, তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও।

৭. তারা যদি তোমাকে ডাকে তাহলে, হাসি মুখে তাদের কথার উত্তর দিবে।

৮. তাদের মৃত্যুর পর তাদের জীবিত আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান প্রদর্শন করবে।

৯. তাদের সাথে ঝগড়া করবে না। তাদের কোন ভুল দেখলে, সঠিকটি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেবে।

১০. তাদের সাথে কোন প্রকার হৎকারীতা করবে না। তাদের উপর তোমার আওয়াজকে উঁচা করবে না। তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে।

১১. মাতা-পিতা যখন তোমার নিকট প্রবেশ করবে তখন তাদের তুমি দাড়িয়ে সম্মান দিবে। তাদের মাথায় চুমু দিবে।

১২. ঘরের কাজ কর্মে মা সহযোগিতা করবে এবং বাহিরের কাজে পিতাকে সাহায্য করবে।

১৩. যত বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজই হোক না কেন, তাদের অনুমতি ছাড়া বাহিরে কোথাও সফরে যাবে না। তারপরও যদি তুমি বাধ্য হও, তাহলে তুমি তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে।

১৪. তাদের কামরায় তাদের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করবে না, বিশেষ করে তাদের ঘুম ও বিশ্রামের সময়।

১৫. তুমি যদি ধূমপানে অভ্যস্ত হও, তাহলে তাদের সামনে ধূমপান করবে না।

১৬. তাদের পূর্বেই খেতে বসবে না, খাওয়ার সময় তাদের সম্মান রক্ষা করে খাবে।

১৭. তাদের বিপক্ষে কোন মিথ্যা কথা বলবে না। আর তারা যদি তোমার অপছন্দ কোন কাজ করে, তুমি তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করো না।

১৮. তুমি স্ত্রী সন্তানদের মাতা-পিতার সন্তুষ্টির উপর প্রাধান্য দিবে না। সবকিছুর পূর্বে তুমি তাদের সন্তুষ্টি কামনা করবে। কারণ, আল্লাহর সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি মাতা-পিতা সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির উপরই নির্ভর করে।

১৯. তাদরে আসন থেকে উঁচা কোন আসনে তুমি বসবে না। অহংকারী করে তাদের দিকে পা বিছিয়ে দিয়ে বসবে না।

২০. তুমি যত বড় নেতা বা চাকুরীজীবী হও, তাদের পরিচয় তুলে ধরতে তুমি কখনোই ভুল করবে না। তাদের পরিচয়কে অস্বীকার করতে এবং কোন কথার মাধ্যমে তাকে কষ্ট দেয়া হতে সম্পূর্ণ সতর্ক থাকবে।

২১. মাতা-পিতার জন্য খরচ করতে তুমি কখনোই কৃপণতা করবে না। এটি অবশ্যই স্ববিরোধী কাজ। কারণ, তোমার সন্তানও তোমার সাথে তাই করবে তুমি যা করে থাক।

২২. বেশি বেশি করে মাতা-পিতাকে দেখতে যাবে, তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের হাদিয়া নিয়ে যাবে। আর তারা ছোট বেলায় তোমাকে যে, লালন-পালন করছে, তার জন্য তাদের কৃতজ্ঞতা আদায় করবে। তুমি তোমার সন্তানদের সাথে তোমার বিষয়টি তুলনা করে দেখবে।

২৪. সর্বাধিক সম্মানের হকদার তোমার মা তারপর তোমার পিতা। আর মনে রাখবে মাতা-পিতার পায়ের তলে সন্তানের বেহেস্ত।

২৫. মাতা-পিতার নাফরমানি করা হতে বিরত থাকবে। অন্যথায় দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ হতে বঞ্চিত হবে। আর তোমার শিশুরা সে রকম আচরণ করবে, যেমনটি তুমি তাদের সাথে করেছিলে।

২৬. যখন মাতা-পিতা হতে কোন কিছু চাইবে, তখন নরম ভাবে চাইবে। যখন তোমাকে দিবে তখন তুমি তাদের শুকরিয়া আদায় করবে, আর যখন নিষেধ করবে, তখন তুমি ক্ষমা চাইবে। তাদের নিকট কোন কিছু পাওয়ার জন্য বাড়াবাড়ি করবে না।

২৭. যখন তুমি কামাই-রুজি করতে সক্ষম হবে, তখন তুমি তাই করবে এবং মাতা-পিতার সাহায্য করবে।

২৮. মনে রাখবে তোমার উপর তোমার মাতা-পিতার অধিকার রয়েছে, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার রয়েছে। সুতরাং, প্রত্যেক পাওনাদারকে তার পাওনা আদায় করবে। উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখবে এবং উভয়ের জন্য গোপনে হাদিয়া পাঠাবে।

২৯. যখন তোমার মাতা-পিতার তোমার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে, তখন তোমাকে অবশ্যই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হবে। তুমি তোমার স্ত্রীকে বোঝাবে যে, যদি সত্য তাদের সাথে হয়, তবে তুমি তাদের পক্ষের লোক এবং তাদের সন্তুষ্টি অর্জনে তুমি বাধ্য।

৩০. বিবাহের ব্যাপারে মাতা-পিতার সাথে যদি মতবিরোধ দেখা দেয়, তখন তোমরা শরীয়তের বিধানকে বিচারক মানবে। কারণ, তোমাদের জন্য উত্তম সহযোগী।

৩১. মাতা-পিতার দোয়া ও বদদোয়া উভয়ই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য। সুতরাং তুমি তাদের বদদোয়া বা অভিশাপ হতে বেচে থাকবে।

৩২. মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার কর, মানুষকে গালি দেবে না, কারণ, যে মানুষকে গালি দেয় মানুষও তাকে গালি দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« من الكبائر شتم الرجل والديه ، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه » .

৩৩. তাদের জীবদ্দশায় তাদের বেশি বেশি দেখতে যাবে। আর তাদের মৃত্যুর পর তাদের পক্ষ হতে তাদের নামে দান-খয়রাত কর। তাদের জন্য এ বলে বেশি বেশি দোয়া করবে-

[رب اغفر لي ولوالدي] হে প্রভূ তুমি আমাকে এবং আমার মাতা-পিতাকে ক্ষমা কর। [رب ارحمهما كما ربياني صغيرا] . হে প্রভূ তুমি আমার মাতা-পিতার প্রতি অনুরুপ দয়া কর, যেমনটি তারা আমাকে ছোট বেলা লালন-পালন করেছিল।